পঞ্চম অধ্যায়

বসুদেবের প্রতি শ্রীনারদ মুনির উপদেশের শেষাংশ

যারা শ্রীহরির পূজা-আরাধনার বিরোধী, যারা নিজেদের ইন্দ্রিয়াদি সংযমে অক্ষম এবং যারা শান্ত প্রকৃতির মানুষ নয়, তাদের পরিণাম বিশ্লেষণের সঙ্গে, প্রত্যেক যুগে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার অনুকূল বিবিধ নাম, রূপ এবং পদ্ধতি প্রকরণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

আদি পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর মুখ, হাত, পা, এবং উরু থেকে (ক্রমানুসারে এবং সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণানুক্রমে) ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ এবং বিভিন্ন চারি আশ্রমের উদ্ভব হয়েছে; চাতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের সকল মানুষেরই সৃষ্টি হয়েছে ভগবান শ্রীহরির আপন সত্তা থেকে, তাই শ্রীহরির আরাধনা যদি তারা না করে, তা হলে তারা নিতান্তই অধঃপতিত হবে। এই সকল মানুষদের মধ্যে নারী এবং শূদ্রগণ, যাদের সচরাচর হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তনের সংযোগ তেমন থাকে না, তাদের বিষম অজ্ঞতার ফলেই তারা বিশেষভাবে মহাত্মাদের কৃপালাভের যোগ্য। অন্যান্য তিন বর্ণের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা বৈদিক প্রথায় দীক্ষা অর্থাৎ শ্রৌত জন্মের মাধ্যমে শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে, তবে বেদশাস্ত্রাদির কল্পিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা অচিরেই বিভ্রান্ত হয়ে যায়। নিজেদের মহা মহা পণ্ডিত মনে করলেও, তারা কর্ম বলতে তার যথার্থ অর্থ না বুঝে তাদের ফলাশ্রয়ী কাজের ফললাভে উদ্‌গ্রীব হয়ে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা আরাধনা করতে থাকে এবং পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তদের উপহাস করে। তারা পরিবার প্রতিপালনের দায়দায়িত্বের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে, জাগতিক তুচ্ছ প্রজল্পে আকৃষ্ট হয় এবং শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে নির্লিপ্ত হয়ে থাকে। তারা জাগতিক ধন-ঐশ্বর্যাদি এবং আমোদ-আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, যথার্থ ভালমন্দ বিচারে অক্ষম হয়, যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয় না, এবং সকল সময়ে মানসিক জল্পনা-কল্পনার পর্যায়ে সক্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ ধরনের পারিবারিক জীবনচর্যায় আসক্তি এবং অন্যান্য প্রবৃত্তির ফলে জনগণের অধিকাংশ মানুষই খুবই স্বাভাবিকভাবে শাস্ত্রের উত্তম উপদেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এই ধরনের জীবনধারা থেকে সর্বপ্রকারে বন্ধন মুক্ত হওয়াই বেদশাস্ত্রাদির মূল শিক্ষা। শুধুমাত্র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য নয়, আত্মার কর্তব্যাদি বিশ্বস্তভাবে সম্পাদনের

সহায়ক হয় যে-সম্পদ, তাকেই যথার্থ-সম্পদ বলা চলে। ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিলাষের পরিণামে পুরুষ এবং নারী সঙ্গমাবদ্ধ হয়ে সন্তানাদি সৃষ্টি করতে চায়। যজ্ঞানুষ্ঠানাদির জন্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে প্রাণী হত্যায় নিয়োজিত হয়ে এই সমস্ত মানব-পশুগুলি নিজেরাই পরজন্মে হিংসার কবলে কষ্টভোগ করে থাকে। যদি নিজের সুখতৃপ্তির জন্য অত্যধিক লালসার ফলে কেউ জীবগণের প্রতি হিংসাত্মক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয় তা হলে পরমাত্মারূপে সকল জীবের শরীরের মধ্যে বিরাজমান ভগবান শ্রীহরিকেও সে আঘাত করে থাকে। ভগবান শ্রীবাসুদেবের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে, অজ্ঞতাপূর্ণ আত্মপ্রবঞ্চকেরা তাদের নিজেদের ধ্বংসকার্য সম্পূর্ণ করে এবং নরকে প্রবেশ করে।

পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন যুগের প্রত্যেকটিতে বিবিধ বর্ণ, নাম এবং রূপ ধারণ করে থাকেন আর বহুবিধ বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় পূজিত হন। সত্যযুগে পরমেশ্বর ভগবানের দেহ বর্ণ হয় শ্বেতশুভ্র, চারটি বাহু থাকে, ব্রহ্মচারীরূপে পোশাক পরিহিত হয়ে হংস প্রমুখ নামে অভিহিত হন এবং ধ্যান যোগের অনুশীলন মাধ্যমে সেবিত হন। ত্রেতাযুগে তিনি লোহিত বর্ণ ও চতুর্ভুজ হন, যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিষ্ঠাতা হন, যজ্ঞে ব্যবহারের উপযোগী স্রুক্, স্রুব ইত্যাদি প্রতীক চিহ্ন ধারণ করেন এবং যজ্ঞাধিপতি রূপে আরাধিত হন। দ্বাপর যুগে তিনি ঘন নীল বর্ণ ধারণ করেন, গৈরিক বসন পরিধান করেন, শ্রীবৎস ও অন্যান্য চিহ্নাদিতে শোভিত থাকেন, বাসুদেব প্রমুখ নামধারী হন এবং বৈদিক তন্ত্রমন্ত্রের বিধি অনুসারে তাঁর শ্রীবিগ্রহ পূজিত হন। কলিযুগে তিনি গৌরবর্ণ হন, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ সহকারে সপার্ষদ কৃষ্ণকীর্তনে মগ্ন থাকেন এবং সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে সেবিত হন। যেহেতু কলিযুগে মানবজীবনের সকল উদ্দেশ্যই শুধুমাত্র ভগবান শ্রীহরির পবিত্র নামের মহিমা কীর্তনের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে, তাই যাঁরা তার যথার্থ সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তারা কলিযুগের প্রশংসা করে থাকেন। কলিযুগে দক্ষিণ ভারতে (দ্রাবিড়দেশে) বহু মানুষ তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, কাবেরী ও মহানদী নামক নদীবহুল অঞ্চলগুলিতে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে আগ্রহী হবে।

সকল প্রকার মিথ্যা অহঙ্কার বর্জন করে মানুষ যদি ভগবান শ্রীহরির চরণে পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে দেবতা কিংবা অন্য কারও কাছে সে আর ঋণী হতে থাকে না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে বিরাজ করেন বলে ভক্তগণ শ্রীভগবানকে ছাড়া অন্য কিছুতে ভরসা করেন না এবং তাই শ্রীভগবানও তাঁর অহৈতুকী কৃপাবলে ভক্তবৃন্দের হৃদয় থেকে সকল প্রকার কলুষিত বাসনা দূর করে থাকেন। বিদেহরাজ শ্রীনিমি তখন নবযোগেন্দ্রবর্গের মুখনিঃসৃত ভাগবৎ-ধর্মের বিশদ

বর্ণনা শ্রবণ করার পরে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর আরাধনা নিবেদন করলেন। তারপরে তাঁরা অন্তর্হিত হলেন।

অতঃপর দেবর্ষি নারদ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিষয়ে বসুদেবকে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বসুদেবকে বলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর পুত্র রূপে এই জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, তবু শ্রীকৃষ্ণকে যেন তিনি তাঁর সন্তান বলে দাবি না করেন। বরং তাঁকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলেই জানেন। শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুভাবে চিন্তা করা সত্ত্বেও শিশুপালের মতো রাজারা তাঁর রূপ চিন্তা করে এবং শ্রীভগবানের সমান শক্তিবলের অধিকারী হতে চান। অতএব বসুদেবের মতো মহান জ্ঞানী ব্যক্তির সাফল্য সম্পর্কে আর বেশি কিছু বর্ণনা না করে, বসুদেবের কার্যকলাপের সাথে পরিচয় লাভ করার চেষ্টা বৃথা।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—নিমিরাজ বললেন; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিম্**—শ্রীহরি; **প্রায়ঃ**—অধিকাংশ; **ন**—কখনই নয়; **ভজন্তি**—যে ভজনা করে; **আত্ম-বিত্তমাঃ**—আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানে আপনারা সকলেই বিজ্ঞ; **তেষাম্**—তাঁদের; **অশান্ত**—অতৃপ্ত; **কামানাম্**—জাগতিক বাসনাদি; **কা**—কি; **নিষ্ঠা**—লক্ষ্য; **অবিজিত**—যারা নিয়ন্ত্রণে অক্ষম; **আত্মানাম**—নিজেদের।

অনুবাদ

নিমিরাজ আরও জানতে চাইলেন—হে প্রিয় যোগেন্দ্রবর্গ, আপনারা সকলেই আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী। তাই, যারা জীবনের অধিকাংশ সময়েই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভজনা করেনি এবং যারা তাদের জাগতিক কামনা-বাসনার তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হয়নি এবং যারা তাদের আত্মসংযম করতে শেখেনি, তাদের গতি কি হবে, সেই বিষয়ে আমাকে কৃপা করে অবহিত করুন।

তাৎপর্য

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে, চমস ঋষি ব্যাখ্যা করেছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে যারা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে, তাদের জীবনধারা কিভাবে অশুভ হয়ে উঠে, এবং করভাজন ঋষি বর্ণনা করেছেন কিভাবে যুগে যুগে ধর্মাচরণের প্রামাণ্য প্রক্রিয়া উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রীভগবানের অবতাররূপে যুগধর্মাবতার আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, দেবতারা যদিও ভগবানের ভক্তমণ্ডলীর আরাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকেন, তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভক্তগণ ঐ সকল বাধা বিপত্তি পদদলিত করে পরম লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর পথ অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে যেতে পারেন। তবে, অভক্ত মানুষদের তেমন কোনই সুবিধা থাকে না। যে মুহূর্তে বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের পথে অন্যমনা হয়, তখনই অশুভ কামনা-বাসনাদির দাস হয়ে তাকে জড়জগতের অনিত্য নানাবিধ আকর্ষণে জড়িয়ে পড়তে হয়। এইভাবে বদ্ধজীব ভগবদ্ভক্তিবিহীন হয়ে সম্পূর্ণরূপে দিব্যজগতের সৎ-চিৎ-আনন্দময় যে জীবনে পঞ্চ দিব্য রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়। যদিও ভক্তগণ দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত আশীর্বাদস্বরূপ ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়াদিতে মগ্ন হন না, তবে দেবতাগণ জড়জাগতিক রূপ, রস ও গন্ধাদি উপভোগে মগ্ন হয়েই থাকেন। আর তার ফলেই, যারা ভগবদ্ভক্ত নয়, তারাও জড়জাগতিক রূপ, রস এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় উপলব্ধির মাধ্যমে, যথা—মৈথুনাসক্ত জীবনের ইন্দ্রিয় সুখভোগের অভিজ্ঞতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এইভাবেই তারা স্বপ্নময় আচ্ছন্নতার মাঝে, বিভিন্ন ধরনের জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কল্পনায় ভেসে চলে, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তাদের নিত্যকালের সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে থাকে। এই ধরনের বিভ্রান্ত মানুষেরা কিভাবে তাদের জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে, সেই বিষয়ে শ্রীচমস মুনির কাছে বিদেহরাজ শ্রীনিমি এখন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

শ্লোক ২

শ্রীচমস উবাচ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ২ ॥

শ্রীচমসঃ উবাচ—শ্রীচমস মুনি বললেন; **মুখ**—মুখ; **বাহু**—বাহু; **উরু**—উরু; **পাদেভ্যঃ**—পদযুগল থেকে; **পুরুষস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আশ্রমৈঃ**—পারমার্থিক চারি আশ্রম; **সহ**—সঙ্গে; **চত্বারঃ**—চারি; **জজ্ঞিরে**—সৃষ্টি হয়; **বর্ণাঃ**—সামাজিক বর্ণ বিভাগ; **গুণৈঃ**—প্রকৃতি গুণাবলীর মাধ্যমে; **বিপ্র-আদয়ঃ**—ব্রাহ্মণগণের পরিচালনায়; **পৃথক্**—বিবিধ।

অনুবাদ

শ্রীচমস মুনি বললেন—পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপের মাধ্যমে তাঁর মুখ, হাত, উরু এবং পদযুগল থেকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সংমিশ্রণে সৃষ্ট ব্রাহ্মণ প্রমুখ

বিভিন্ন সামাজিক চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল। সেইভাবেই চার প্রকার পারমার্থিক সমাজ চতুরাশ্রম ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যারা আকৃষ্ট হতে পারে না, তারা ক্রমশ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মাধ্যমে চারপ্রকার বর্ণবিভাগের সমাজ শ্রেণী এবং চার প্রকার পারমার্থিক বিভাগের কর্মবিভাগের মাধ্যমে শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে, ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ থেকে জন্মগ্রহণ করেন, ক্ষত্রিয়রা সত্ত্ব ও রজোগুণের সংমিশ্রণে, বৈশ্যরা রজো ও তমোগুণের সংমিশ্রণে এবং শূদ্র তমোগুণের প্রভাবে জন্মগ্রহণ করে থাকে। যেভাবে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপের মুখ, বাহু, উরু এবং পদযুগল থেকে চারি বর্ণ ও আশ্রমের উদ্ভব হয়েছিল, তেমনই ব্রহ্মচারীরা শ্রীভগবানের হৃদয় থেকে, গৃহস্থরা তাঁর উরুদেশ থেকে, বানপ্রস্থরা তাঁর বক্ষ থেকে এবং সন্ন্যাসীরা তাঁর শিরোদেশ থেকে সৃষ্টি হয়েছেন।

একই ধরনের শ্লোক *ঋক্‌সংহিতা* (৮/৪/১৯), *শুক্লযজুর্বেদ* (৩৪/১১) এবং *অথর্ববেদ* (১৯/৬৬)-এর মধ্যেও দেখা যায়—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহুরাজন্যঃ কৃতঃ ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্য পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজয়ত ॥

"ব্রাহ্মণেরা তাঁর মুখ থেকে, রাজা তাঁর বাহু থেকে, বৈশ্যরা তাঁর উরুস্বরূপ, এবং শূদ্রেরা তাঁর শ্রীচরণ থেকে উদ্ভূত হন।"

জানা গেছে যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে ইতিপূর্বেই দ্রুমিল এবং আবির্হোত্র নামে দুই যোগেন্দ্র ঋষি বর্ণনা করেছেন। চমস মুনি এখন বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থার বর্ণনা করছেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিরোধীভাবাপন্ন মানুষদের ক্রমশ শুদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে এবং ভগবৎ-প্রেমের নিত্যসত্তায় তাদের পুনরধিষ্ঠিত করবার জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। সেইভাবেই, শ্রীভগবানের বিরাট রূপ একটি কাল্পনিক রূপ যার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের মর্যাদা ক্রমশ উপলব্ধির পক্ষে একান্ত জড়বাদী মানুষদের সহায়ক হতে পারে। যেহেতু নির্বোধ জড়বাদী মানুষ জড়বস্তুর বাইরে কোনও কিছু বুঝতে পারে না, তাই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটিকে পরমেশ্বর ভগবানের শারীরিক রূপের আকারে বুঝতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। নিরাকার অস্তিত্বের আকার-আকৃতিবিহীন ধারণা নিতান্তই শ্রীভগবানের চিন্ময় শক্তির কোনও ধারণা ব্যতীত অনিত্য জড়জাগতিক বৈচিত্র্য বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকে। পরমেশ্বর শ্রীভগবান হ্লাদিনী তথা অনন্ত আনন্দ, সন্ধিনী তথা অনন্ত অস্তিত্ব এবং

সম্বিৎ তথা অনন্ত শক্তি নামক মুখ্য চিন্ময় শক্তিগুলিতে পরিপূর্ণ। এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীভগবানের বিরাট রূপ থেকে উদ্ভূত বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রীভগবান যে কার্যক্রম উপহার দিয়েছেন, তার ফলে বদ্ধ জীবের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও পারমার্থিক ব্যবস্থায় ক্রমশ নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের সহায়ক হতে পারে।

শ্লোক ৩

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৩ ॥

যঃ—যিনি; **এষাম্**—এইগুলির মধ্যে; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **আত্ম-প্রভবম্**—তাদের নিজেদেরই সৃষ্টির মূল সত্তা; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **ন**—করে না; **ভজন্তি**—ভজনা; **অবজানন্তি**—অবজ্ঞা; **স্থানাৎ**—তাদের স্বীয় মর্যাদা থেকে; **ভ্রষ্টাঃ**—ভ্রষ্ট হয়; **পতন্তি**—তারা পতিত হয়; **অধঃ**—নিচে।

অনুবাদ

চাতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কোনও মানুষ যদি তাদের সৃষ্টির মূল সত্তাস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানকে পূজা-আরাধনা জানাতে ব্যর্থ হয় কিংবা ইচ্ছাপূর্বক অবমাননা করে, তবে তার স্বীয় মর্যাদার অবস্থান থেকে পতন হয়ে নারকীয় জীবন যাপন করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের মধ্যে *ন ভজন্তি* শব্দগুলির মাধ্যমে সেই সমস্ত মানুষদের বোঝানো হয়েছে, যারা অজ্ঞতাবশত পরমেশ্বর ভগবানের পূজা আরাধনা করে না, সেই সঙ্গে *অবজানন্তি* শব্দটি সেই ধরনের মানুষদের বোঝানো হয়েছে, যারা শ্রীভগবানের পরম মর্যাদার কথা জেনে শুনেও তাঁকে অশ্রদ্ধা করে থাকে। ইতিপূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, চারপ্রকার পারমার্থিক এবং কর্মভিত্তিক জীবনধারা শ্রীভগবানের দিব্য শরীর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বস্তুত, পরমেশ্বর ভগবানই সব কিছুর উৎস, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) বলা হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবঃ*। যারা অজ্ঞতাবশত পরমেশ্বর ভগবানের মর্যাদা বুঝতে চেষ্টা করে না, তাছাড়া যারা তাঁর দিব্য মর্যাদার কথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও শ্রীভগবানের অমর্যাদা করে থাকে, তারা অবশ্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থার মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হবে, যে কথা *স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ* শব্দগুলির মাধ্যমে বলা হয়েছে। *পতন্ত্যধঃ* শব্দসমষ্টি দ্বারা বোঝায় যে, বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থা থেকে যে মানুষ বিচ্যুত হয়, তারপক্ষে পাপকর্মাদি বর্জন করে চলার কোনও উপায় থাকে না; তা ছাড়া ঐ ধরনের কোনও মানুষই যজ্ঞাদি সম্পন্ন করে কোনও ফললাভ

করতে পারে না, এবং তার ফলে সে ক্রমশ অধঃপতিত হতে হতে নারকীয় জীবন-পরিবেশে নিমজ্জিত হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, পারমার্থিক সদ্‌গুরুকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা-আরাধনা করতে না শিখলে তার পরিণামেই মানুষ আপন মর্যাদা হারায় এবং সেই মূল কারণেই শ্রীভগবানের বিরাগভাজন হয়। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা সহকারে প্রণিপাত জানিয়ে পূজা-আরাধনা করতে যে অভ্যস্ত হতে শিখেছে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পরমেশ্বর ভগবানকে যথার্থ পূজা নিবেদন করে থাকে। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে ধার্মিক মানুষরূপে পরিচিত মানুষও ক্রমশ ভগবদবিরোধী হয়ে ওঠে, নির্বোধের মতো কল্পনাজাত চিন্তাধারার মাধ্যমে শ্রীভগবানের মর্যাদা হানি করে এবং নারকীয় জীবনধারার মাঝে অধঃপতিত হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শ্লোকে উল্লিখিত পুরুষ শব্দটির দ্বারা শ্রীগর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুকে বোঝানো হয়েছে, যাঁকে পুরুষসূক্ত স্তোত্রাবলীর মাধ্যমে মহিমান্বিত করা হয়েছে। যদি কেউ তার সামাজিক উচ্চ মর্যাদার বশে অহঙ্কৃত হয়ে মনে করে যে, শ্রীভগবানও প্রকৃতির সৃষ্টি এবং সকল জীবের উৎস বলতে কোনই পরম সত্তা নেই, তা হলে ঐ ধরনের অহঙ্কৃত নির্বোধ মানুষকে অবশ্যই বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থা থেকে অধঃপতিত হতে হবে এবং নিতান্ত শৃঙ্খলাহীন পশুর মতো জীবন কাটাতে হবে।

শ্লোক ৪

দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্ দূরে চাচ্যুতকীর্তনাঃ ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥ ৪ ॥

দূরে—বহু দূরে; **হরি-কথাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের বিষয়ে হরিকথা আলোচনা; **কেচিৎ**—বহু লোক; **দূরে**—বহু দূরে; **চ**—এবং; **অচ্যুত**—অক্ষয়; **কীর্তনাঃ**—মহিমা; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রী লোকেরা; **শূদ্র-আদয়ঃ**—শূদ্রগণ এবং অন্যান্য পতিতজনেরা; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **তে**—তারা; **অনুকম্প্যাঃ**—কৃপা অভিলাষী; **ভবাদৃশাম্**—আপনার মতো মহানুভব ব্যক্তিগণের।

অনুবাদ

বহু লোক আছেন যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন না এবং তাই শ্রীভগবানের অক্ষয় কীর্তি গাথা উচ্চারণ তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। সেই ধরনের নারী, শূদ্র এবং অন্যান্য পতিতজনের সর্বদাই আপনার মতো মহানুভব ব্যক্তিদের কৃপা অভিলাষী হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কিছু মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা সম্পর্কে অজ্ঞ (*ন ভজন্তি*), অথচ অন্যেরা শ্রীভগবানের কথা জানলেও, তাঁকে উপহাস করে কিংবা বলে যে, শ্রীভগবানও তো জড়জাগতিক (*অবজানন্তি*)। এই শ্লোকটিতে প্রথম পর্যায়ের, তথা অজ্ঞ লোকেদের পক্ষে, শুদ্ধ ভক্তের কৃপালাভের যথার্থ যোগ্যতা আছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *দূরে* শব্দটির দ্বারা বোঝায়— যারা শ্রীভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের সামান্য সুযোগই পেয়ে থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, তাদের মতো মানুষদের যে *সাধুসঙ্গভাগ্যহীনাঃ* অর্থাৎ যারা সাধুসঙ্গ ও শুদ্ধভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভে বঞ্চিত বলা চলে। সচরাচর, যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পারমার্থিক বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রণী হয়েছেন, তাঁরা নারী সমাজ ও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সঙ্গ পরিহার করেই চলেন। সাধারণত, নারীরা কামলোভাতুর হন, এবং শূদ্রাদি তথা নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা স্বভাবত ধূমপান, মদ্যপান এবং নারী সঙ্গ লিপ্সার মতো জাগতিক অভ্যাসে আসক্ত হয়ে থাকে। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাধুদের অর্থাৎ সদাচারী মানুষদের পক্ষে নারীসঙ্গ এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সাথে অন্তরঙ্গতা পরিহার করে চলতে উপদেশ দিয়েছেন। ঐ ধরনের বিধিনিষেধের বাস্তব পরিণাম এই হয় যে, নারীরা এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রায়ই সাধুসমাজের দ্বারা কীর্তিত শ্রীভগবানের গুণগাথা শোনবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে; এই জন্যই শ্রীচমস্ মুনি রাজাকে পরামর্শ দেন যে, ঐ ধরনের পতিতদের কল্যাণে তাঁর কৃপা বিতরণ করা বিশেষভাবেই কর্তব্য।

আমাদের পারমার্থিক গুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সকল শ্রেণীর নারী ও পুরুষকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রবলভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। অবশ্য, ভারতের তথাকথিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা এবং শুধুমাত্র যাগযজ্ঞের আনুসঙ্গিতায় যত্নবান কিছু মানুষই এইভাবে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যে নারীসমাজ ও নিম্নশ্রেণীর পরিবারবর্গকে স্বচ্ছন্দে বৈষ্ণব সংস্কৃতির মধ্যে, এমনকি শুদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে দীক্ষা গ্রহণের মধ্যেও অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে মর্মাহত হন। যাইহোক, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই যুগে বাস্তবিকই প্রত্যেক মানুষই অধঃপতিত হয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেন যে, পারমার্থিক জীবনধারা যদি শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণী বলতে যাদের বোঝায়, তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তা হলে সারা পৃথিবীতে যথার্থ পারমার্থিক ভাবধারার আন্দোলন প্রসারিত করার কোনও সম্ভাবনাই থাকবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা এতই মহান্ এবং পবিত্র

কৃষ্ণনাম এতই শক্তিশালী যে, নারী পুরুষ, শিশু, এমন কি পশুও কৃষ্ণনাম কীর্তনের মাধ্যমে এবং পবিত্র কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণের ফলে শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের মধ্যে আত্ম-উপলব্ধির সর্বোচ্চ সার্থকতা অর্জনে আগ্রহী কোনও মানুষকেই বাধা দেওয়া হয় না। যেক্ষেত্রে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী এবং যোগীরা স্বার্থপরতার মনোভাব নিয়ে তাদের নিজেদের আত্মশুদ্ধি এবং সিদ্ধিলাভের জন্য যৌগিক শক্তির চর্চায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন, তখন বৈষ্ণবদের প্রথায় সকল শ্রেণীর জীবকেই কৃপা প্রদর্শনের রীতি মেনে চলা হয়।

মনে করা হয় যে, বহু শত সহস্র বৎসর আগে, আনুমানিক শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে নবযোগেন্দ্রবর্গ এবং নিমিরাজের মধ্যে কথোপকথন হয়েছিল। তবে মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে কথিত *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং উল্লেখ করেছেন যে, জীবনের জাগতিক পরিবেশ পরিস্থিতি নির্বিশেষে যে কোনও মানুষই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শ্রীভগবানের পরম ভক্ত হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং, কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের অবশ্যই বৈষ্ণবদের বিশেষ কৃপার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করার মাধ্যমে তাদের জীবন সার্থক করে নিজ আলয়ে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করা উচিত।

শ্লোক ৫

বিপ্রোরাজন্যবৈশ্যো বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্ ।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ ॥ ৫ ॥

বিপ্রঃ—ব্রাহ্মণগণ; **রাজন্য-বৈশ্যৌ**—রাজন্যবর্গ এবং বৈশ্যগণ; **বা**—কিংবা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির; **প্রাপ্তাঃ**—আশ্রয় লাভের অধিকার; **পদ-অন্তিকম্**—পাদপদ্মের কাছে; **শ্রৌতেন-জন্মনা**—বৈদিক দীক্ষার মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্মলাভ করে; **অথ**—অতঃপর; **অপি**—এমন কি; **মুহ্যন্তি**—বিভ্রান্ত হয়ে; **আম্নায়-বাদিনঃ**—বিবিধ প্রকার জড়জাগতিক দার্শনিক মতবাদ স্বীকার করার পরে।

অনুবাদ

অন্যদিকে, ব্রাহ্মণেরা, রাজন্যবর্গ এবং বৈশ্যগণ বৈদিক দীক্ষানুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বিজত্ব গ্রহণের পরেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হতে পারলেও, বিভ্রান্ত হয়ে নানা প্রকার জড়জাগতিক দর্শনাদির পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

তাৎপর্য

কথায় বলে, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। জড়জাগতিক সমাজের মান মর্যাদায় যারা বৃথা গর্ববোধ করে এবং তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তাদের সেবা-আরাধনা

সার্থক করে তোলার বিষয়ে অবহেলা করে থাকে, এই শ্লোকটির মাধ্যমে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। *মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ*—বর্ণাশ্রমের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জীব ইন্দ্রিয় উপভোগে আকৃষ্ট হয়ে, ঐ ধরনের-মানুষেরা, পরমতত্ত্ব যা জড়জাগতিক বিষয় নয়, তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে মায়াময় জাগতিক জীবনদর্শনে আগ্রহান্বিত হয়ে থাকে। বৈদিক প্রথার মধ্যে, এই শ্লোকে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ সকলকেই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে এবং তাদের দ্বিজ অর্থাৎ উচ্চ সভ্যতাসম্পন্ন মানুষ রূপে বিবেচনা করা হয়। বৈদিক শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে, বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণের সাহায্যে, ধর্মাচরণমূলক উৎসব অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের মাধ্যমে এবং পারমার্থিক গুরুদেব ও পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার মাধ্যমে ঐ সকল মানুষ ক্রমশই পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের নিকটবর্তী হতে থাকেন। যদি কেউ ঐ ধরনের মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থায় তার উন্নতি সম্পর্কে অহঙ্কার বোধ করে কিংবা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অনুসরণকারীদের জীবনে যে ধরনের স্বর্গসুখের আনন্দ অনুভূত হতে থাকে, তাতে প্রলুব্ধ হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে মানুষ জন্ম ও মৃত্যুর জড়জাগতিক মায়াময় আবর্তে প্রত্যাবর্তন করে। এমন কি উচ্চমর্যাদার অধিকারী দেবতাগণও মায়ার প্রলোভনে বঞ্চিত হয়ে থাকেন, যে কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম শ্লোকটিতেই বলা হয়েছে—*মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।*

ঐ ধরনের মূঢ় ব্যক্তিরা অজ্ঞানতাবশত (*অবজানন্তি*) পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় উদ্যোগ হ্রাস করবার প্রয়োজনে জড় বিষয়াদি নিয়ে উপভোগের কাল্পনিক বাসনার সমর্থনে যে সমস্ত বৈদিক কর্মকাণ্ডের অংশে বৃথাই সমান উপযোগিতা আরোপ করতে প্রয়াসী হয়ে থাকে, সেইগুলি বিধিবদ্ধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে স্বর্গসুখ দিয়ে থাকে বলে তারা ভুল ধারণা করে থাকে। ঐ ধরনের অপদার্থ যুক্তিবাদী মানুষদের কথা *ভগবদ্গীতায়* (২/৪২) এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥

"বিবেকবর্জিত মানুষেরাই বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে স্বর্গসুখ, উচ্চকুলে জন্ম, ক্ষমতা লাভ ইত্যাদি সকাম কর্মকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ এবং ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বলে যে, তার ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *ভগবদ্গীতার* এই শ্লোকটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এর মধ্যে বর্ণিত বিরুদ্ধবাদী মানুষদের একটি পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছেন।

"সাধারণত মানুষ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, এবং তাদের মূর্খতার ফলেই তারা বেদের কর্মকাণ্ডে বর্ণিত সকাম কর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে. যেখানে সুরা এবং নারীসঙ্গ পাওয়া যায় ও যেখানে ভোগ-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, সেই স্বর্গলোকে গিয়ে ইন্দ্রিয়ের চরম তৃপ্তি সাধন করাই ঐ শ্রেণীর মানুষদের পরম কাম্য। স্বর্গলোকে যাওয়ার জন্য বেদে নানা প্রকার যজ্ঞের বিধান দেওয়া আছে, সেইগুলির মধ্যে 'জ্যোতিষ্টোম' যজ্ঞ বিশেষভাবে ফলপ্রদ।

"বেদে আছে, যে মানুষ স্বর্গলোকে যেতে চায়, তার পক্ষে এই সমস্ত যজ্ঞগুলি অবশ্য পালনীয়। তাই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে, এটাই বৈদিক জ্ঞানের চরম শিক্ষা। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেদের পক্ষে একাগ্রচিত্তে ভগবদ্ভক্তি সাধন করা সম্ভব হয় না। বিষবৃক্ষের ফল দেখে মূর্খব্যক্তি যেভাবে লালায়িত হয়, তেমনই অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা স্বর্গলোকের ঐশ্বর্যের প্রতি লালায়িত হয়ে তা ভোগ করবার বাসনায় লালায়িত হয়ে ওঠে।"

"বেদের কর্মকাণ্ডে আছে যে, চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করলে মানুষ স্বর্গলোকে গিয়ে সোমরস পান করে অমরত্ব লাভ করে এবং চিরকালের জন্য সুখী হতে পারে। এই পৃথিবীতেও বহু লোক আছে যারা সোমরস পান করবার জন্য নিতান্ত উৎসুক—সোমরস পান করে বল ও বীর্য বর্ধন করে কিভাবে আরও বেশি ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করতে পারবে, সেটাই তাদের একমাত্র কাম্য। ঐ ধরনের মানুষেরা জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ায় বিশ্বাস করে না, এবং তারা বৈদিক যজ্ঞাদির আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে খুবই আসক্ত হয়ে থাকে। তারা সচরাচর ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়, এবং তারা জীবনে স্বর্গসুখ ছাড়া আর কিছুই চায় না। তারা মনে করে যে, স্বর্গের নন্দনকাননে সোমরস পান করে অপরূপ রূপসী অপ্সরাদের সঙ্গ লাভ করাই ইন্দ্রিয় সুখের চরম প্রাপ্তি। ঐ ধরনের দৈহিক সুখ লাভ অবশ্যই ইন্দ্রিয়াসক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়; সেই কারণেই জড় জগতের প্রভু তথা সর্বময় কর্তারূপে যারা রয়েছে, তারা একান্তভাবেই জড়জাগতিক অস্থায়ী সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।"

এই শ্লোকটির তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি এই যে, ঐ ধরনের যে সব বিভ্রান্ত জড়বাদী মানুষেরা বেদশাস্ত্রাদির মধ্যে উল্লিখিত জড়জাগতিক অংশগুলির প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে থাকে (*মুহ্যন্তি আম্নায়বাদিনঃ*), তারা পরমেশ্বর ভগবান যিনি পরম ভোক্তা (*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্*), তাঁর পরম ভোক্তা স্বরূপ মর্যাদা অগ্রাহ্য করতে চায়। আর সেই সঙ্গে বৈদিক নীতিসমূহের অনুগামীরূপে তাদের নিজেদের উচ্চ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়াসী হয়। ঐ ধরনের বিচারিতাদুষ্ট মানুষেরা জৈমিনি ঋষির মতো জড়জাগতিক দৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক, যারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব নস্যাৎ করতে চায়

(*ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ*), এবং তাই পরম জ্ঞাতব্য তত্ত্বস্বরূপ জড়জাগতিক ফলাশ্রয়ী সকাম ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করতেই পরামর্শ দিয়ে থাকে, তাদেরই মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে চলতে থাকে। ঐ ধরনের যে সব মানুষদের বেদজ্ঞ দার্শনিক বলে মনে করা হয়ে থাকে, তাদের এক ধরনের মার্জিত রুচিসম্পন্ন নিরীশ্বরবাদী ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না, যেহেতু তারা পরমেশ্বর ভগবানের পরম সত্তার বিরুদ্ধেই প্রচার করে থাকে। যদিও বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থার নির্বোধ জড়জাতিক অনুসরণকারী মানুষেরা নিজেদের আর্য তথা দ্বিজ মর্যাদাসম্পন্ন পরিচিতি অক্ষুণ্ণ রাখতেই আগ্রহী এবং একই সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে থাকে, তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩) সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে *স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ*—ঐ ধরনের মানুষেরা অবশ্যই স্বীয় মর্যাদা থেকে অধঃপতিত হয়ে নারকীয় জীবন যাপন করতে থাকে। এই শ্লোকে *মুহ্যন্তি* শব্দটির মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। কখনও-বা এই ধরনের গর্বোদ্ধত মানুষগুলি গুরুরূপেও নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। অবশ্য, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, এই ধরনের মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে বৈদিক জ্ঞানসম্ভারে 'গুরু' না হয়ে বরং 'লঘু' মর্যাদারই অধিকারী বলা চলে। মানুষের নিজের পরম কর্তব্য (*স্বার্থগতি*) এবং পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যেও যথার্থ কর্তব্য পালনের জন্যই কর্ম ও জ্ঞান রূপে বিশেষভাবে বর্ণিত সমস্ত জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপ বর্জন করাই মানুষের একান্ত করণীয় এবং এইভাবেই শ্রীভগবানের পাদপদ্মে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। শুধুমাত্র একান্ত হতভাগ্য মানুষই মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোকুলানন্দের চরণকমলে পরমানন্দে আত্মসমর্পণ করার চেয়েও অন্য কোনও অধিকতর তৃপ্তিকর কাজ থাকতে পারে।

শ্লোক ৬

কর্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।
বদন্তি চাটুকান্ মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥ ৬ ॥

কর্মণি—ফলাশ্রয়ী কাজের বিষয়ে; **অকোবিদাঃ**—অজ্ঞ; **স্তব্ধাঃ**—বৃথা গর্বোদ্ধত; **মূর্খাঃ**—মূর্খেরা; **পণ্ডিত-মানিনঃ**—নিজেদের মহাপণ্ডিত মনে করার ফলে; **বদন্তি**—তারা বলে থাকে; **চাটুকান্**—চাটুকারী প্রার্থনাদি; **মূঢ়াঃ**—বিভ্রান্ত; **যয়া**—যার দ্বারা; **মাধ্ব্যা**—মধুময়; **গিরা**—বাক্য; **উৎসুকাঃ**—অতিশয় উৎসুক।

অনুবাদ

ফলাশ্রয়ী কাজকর্মের বিষয়ে অনভিজ্ঞ এই ধরনের গর্বোদ্ধত মূর্খলোকেরা বেদসম্ভারের মধুময় বাক্যে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের মহাপণ্ডিত মনে করে

আত্মম্ভরিতা দেখায় এবং দেবতাদের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে চাটুকরী প্রার্থনাদি নিবেদন করে থাকে।

তাৎপর্য

কর্মণ্যকোবিদাঃ শব্দসমষ্টির দ্বারা সেই সব মানুষদের বোঝায় যারা কাজকর্ম সম্পন্ন করার মাধ্যমে কিভাবে ভবিষ্যতের কোনও বন্ধন সৃষ্টি হবে না, সেই বিষয়ে মূর্খ। এই *কর্মকৌশল ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) বর্ণিত হয়েছে—*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই সকল কর্ম সাধন করা উচিত, নতুবা জড় জগতের জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে কর্মফলের মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। *তব্ধাঃ* শব্দটিতে বোঝায় "বৃথা অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে থাকা," অর্থাৎ অজ্ঞ মূর্খ লোকেরা কর্ম সম্পাদনের কৌশল যথাযথভাবে না জেনেও, সেই বিষয়ে শিক্ষিত ভগবদ্ভক্তদের কাছে কিছু জানতেও চায় না, কিংবা শ্রীভগবানের পার্ষদবর্গের উপদেশাবলীও গ্রহণ করে না।

বৈদিক গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত সকাম ক্রিয়াকর্মে উৎসাহী হয়ে এই ধরনের মূর্খ মানুষেরা মনে করে, "আমরা সুশিক্ষিত বৈদিক পণ্ডিত; আমরা সবকিছু ঠিকমতো বুঝেছি।" তার ফলে তারা এই সমস্ত বৈদিক বাক্যে আকৃষ্ট হয়, যেন—*অপামসোমম্ অমৃতা অভূম* ("আমরা সোমরস পান করেছি এবং এখন আমরা অমর হয়ে গেছি") *অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্মাস্য যজ্ঞঃ সুকৃতং ভবতি* ("কারণ চাতুর্মাস্য ব্রত যে পালন করে, তার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়"), এবং *যত্র নোষ্ণং ন শীতং ন্যান্ন গ্লানির্নাপারাতয়ঃ* ("যেখানে শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, গ্লানি নেই এবং কোনও শত্রুতা নেই, আমরা সেই গ্রহে যেতে চাই")। এই সমস্ত মূর্খ লোকেরা জানে না যে, স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কালে নিঃশেষ হয়ে যাবেন, তা হলে প্রচুর পরিমাণে ইন্দ্রিয় উপভোগে আকাঙ্ক্ষী এই সমস্ত বেদ-অনুসারী জড়জাগতিক মূর্খ বিভ্রান্ত মানুষগুলি যারা ব্যাঙের মতো বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহে লাফিয়ে বেড়ায়, তাদের কথা আর না বলাই ভালো। এই সমস্ত বিভ্রান্ত বেদজ্ঞেরা স্বর্গলোকের উদ্ভিন্নযৌবনা বারনারী অপ্সরাদের যারা সঙ্গীতে, নৃত্যে এবং সাধারণত অসংযমী কামভাবনা উদ্রেকে পটীয়সী, তাদের সাথে আমোদ-আহ্লাদ করবার স্বপ্ন দেখে। এইভাবেই, বেদসমগ্রের কর্মকাণ্ড অংশে বর্ণিত স্বর্গসুখের কল্পনাটে যারা বিমোহিত হয়, তাদের মধ্যে ভগবৎ-বিরোধী তথা নিরীশ্বরবাদী মনোবৃত্তি জেগে উঠে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্যই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাবেই বদ্ধজীব ক্রমশ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের মায়ামোহ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে দিব্য নিত্যধামে নিজেকে উন্নত করতে পারে। তবে, বৃথা

অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে বেদের জড়জাগতিক অনুসরণকারীরা পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে চিরকাল অজ্ঞ থেকেই যায়।

শ্লোক ৭

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ॥ ৭ ॥

রজসা—রজোগুণের আধিক্যে; **ঘোর-সঙ্কল্পাঃ**—ঘোরতর বাসনাদি নিয়ে; **কামুকাঃ**—কামপ্রবণ; **অহিমন্যবঃ**—সাপের মতো তাদের ক্রুদ্ধ মন; **দাম্ভিকাঃ**—প্রবঞ্চক; **মানিনঃ**—অত্যন্ত অহঙ্কারী; **পাপাঃ**—পাপী; **বিহসন্তি**—পরিহাসপ্রিয়; **অচ্যুত-প্রিয়ান্**—অচ্যুত পরমেশ্বর শ্রীভগবানের প্রিয়জনদের প্রতি।

অনুবাদ

রজোগুণের প্রভাবে, বৈদিক শাস্ত্রের জড়জাগতিক অনুসারীদের মধ্যে উগ্র মানসিকতা জাগে এবং তারা অত্যন্ত কামপ্রবণ হয়ে থাকে। তাদের ক্রোধ সাপের মতো উগ্র হয়। প্রবঞ্চক, অহঙ্কারী এবং পাপাচারী এই সব মানুষেরা ভগবান শ্রীঅচ্যুতের প্রিয় ভক্তদের পরিহাস করে থাকে।

তাৎপর্য

ঘোরসঙ্কল্পাঃ কথাটির মাধ্যমে এমন ধরনের উগ্র মানসিকতা বোঝায়, যার মাধ্যমে চিন্তা হতে থাকে—"সে আমার শত্রু, তার মৃত্যু হোক।" রজোগুণের প্রভাবে, কামপ্রবণতায় ভাবাবেগে বদ্ধজীব আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখন সে সাপের মতোই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দম্ভ এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ ঐ ধরনের মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণে নিয়োজিত ভগবদ্ভক্তদের সামান্য প্রচেষ্টাও সহ্য করতে পারে না। সে মনে করে, "এই সমস্ত ভিখারিরা তাদের উদরপূর্তির জন্যই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা-আরাধনা করছে, কিন্তু তারা কখনই সুখী হবে না।" এই ধরনের জড়জাগতিক নির্বোধ মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের সুরক্ষায় এবং আশীর্বাদে যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত কাজ করে চলেছেন, তাঁদের দিব্য মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্লোক ৮

বদন্তি তেঽন্যোন্যমুপাসিতস্ত্রিয়ো
গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ ।
যজন্ত্যসৃষ্টান্নবিধানদক্ষিণং
বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ ॥ ৮ ॥

বদন্তি—বলে; **তে**—তারা; **অন্যোন্যম্**—প্রত্যেকের মধ্যে; **উপাসিত-স্ত্রিয়ঃ**—যারা নারী ভজনায় নিয়োজিত; **গৃহেষু**—তাদের গৃহমধ্যে; **মৈথুন্য-পরেষু**—যা নিতান্তই মিথুনক্রিয়ায় নিয়োজিত হয়; **চ**—এবং; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **যজন্তি**—তারা ভজনা করে; **অসৃষ্ট**—কর্তব্য না করে; **অন্ন-বিধান**—অন্ন বিতরণ; **দক্ষিণম্**—পূজারীদের প্রদত্ত দক্ষিণা; **বৃত্ত্যৈ**—তাদের জীবিকার জন্য; **পরম্**—কেবল; **ঘ্নন্তি**—তারা হত্যা করে; **পশূন্**—পশুদের; **অতৎ-বিদঃ**—সেই ধরনের আচরণের পরিণাম না জেনে।

অনুবাদ

বৈদিক যাগযজ্ঞাদির জড়জাগতিক অনুসরণকারীরা শ্রীভগবানের উপাসনা বর্জন করে, তার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জীবনে তাদের স্ত্রীদেরই ভজনা করতে থাকে, এবং তার ফলে তাদের গৃহজীবন একেবারেই মৈথুনাসক্তিময় হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই ধরনের জড়জাগতিক গৃহস্থ পরিবারবর্গ পরস্পরকে একই রকমের অবিন্যস্ত জীবনধারায় অভ্যস্ত হতে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি সবই দৈহিক প্রতিপালনের জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম মনে করার ফলে, ঐ সব গৃহস্থেরা এমন ধরনের অবৈধ উৎসব অনুষ্ঠানাদি পালন করতে থাকে, যেখানে ব্রাহ্মণদের এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে খাদ্য কিংবা দান বিতরণের কোনই ব্যবস্থা থাকে না। তার পরিবর্তে, তারা নিষ্ঠুরভাবে ছাগ ইত্যাদি নিরীহ পশু হত্যা করে থাকে এবং তাদের সেই ধরনের কাজকর্মের বিষময় প্রতিফলনের কথা কোনওভাবেই বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

মিথ্যা অহমিকা অবশ্যই মৈথুনাসক্তি ছাড়া চলে না। তাই, মৈথুনাসক্ত জড়বাদী গৃহস্থেরা সাধুসজ্জনদের শ্রদ্ধাভক্তি জানাতে মোটেই আগ্রহী হয় না, বরং অনবরত মৈথুন সুখভোগের ব্যাপারে তাদের পত্নীদের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে এবং তাদেরই ভজনা করে। ঐ ধরনের নিন্দনীয় মানুষদের শ্রীভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৩) বর্ণনা করেছেন—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥

"আজ আমার এত লাভ হল, এবং ভবিষ্যতে আমার পরিকল্পনা অনুসারে আরও লাভ হবে। এখন আমার এত ধন আছে, এবং ভবিষ্যতে আরও ধন লাভ হবে।"

সাধারণত, জড়জাগতিক গৃহস্থেরা নিজেদের খুবই ধর্মপ্রাণ বলেই মনে করে থাকে। আসলে, অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারগোষ্ঠী প্রতিপালনের ফলে তারা

'দায়িত্বজ্ঞানশূন্য' সাধুরা যারা পরিবার-পরিজনের জন্যে সংগ্রাম করে না, তাদের চেয়ে নিজেদের অনেক বেশি ধার্মিক মানুষ বলেই মনে করে। জড়জাগতিক শরীরের সাধনা করতে করতে, তারা যে সব সামান্য সরল ব্রাহ্মণেরা সাধারণ আর্থিক উন্নতির পথে তেমন সাফল্য লাভ করে না, তাদের সম্পর্কে ঘৃণাবোধ পোষণ করে থাকে। ঐ ধরনের দরিদ্র ভিখারীদের মতো মানুষদের তারা দয়াদাক্ষিণ্যেরও অযোগ্য বলে মনে করে এবং তার বদলে শুধুমাত্র তাদের নিজেদের পরিবারবর্গের মানুষদেরই মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধির অনুকূলে যাগযজ্ঞ নিবেদন করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন, *উপেক্ষ্য বৈ হরিং তে তু ভূত্বা যজ্ঞাঃ পতন্ত্যধঃ।* ধর্মানুষ্ঠানের বিপুল আয়োজনকারী বলে নিজেদের সম্পর্কে গর্ববোধ করলেও যারা শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর অবহেলা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে থাকে, তাদের সুনিশ্চিত পতন ঘটে। এই ধরনের মূর্খ মানুষেরা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরকে আশীর্বাদ করে শুভকামনা জানায়, "পুষ্পমাল্যভারে চন্দনচর্চিত হয়ে এবং সুন্দরী নারীসঙ্গে তোমাদের জীবন ভরে উঠুক।"

যে সব মানুষ নারীপ্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, তারা অবিকল নারীস্বভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। জাগতিক ভোগবাদী মহিলারা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে আগ্রহী হয় না এবং তারা নিতান্তই নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সুখভোগের চেষ্টা করে চলে। সুতরাং তারা পরমাগ্রহে তাদের পতিদের কাছ থেকে সেবাযত্ন আদায় করে চলে এবং যদি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় পতির আগ্রহ দেখা যায়, তা হলে তাতে বিষম অনাগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। এই ধরনের মূর্খের স্বর্গে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে পতি এবং পত্নী উভয়েই পরস্পরকে অনিত্য সুখাস্বাদনে উৎসাহ দিতে থাকে। তারা ভগবানের লীলাকথা আলোচনা কিংবা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করে না। বরং নিজেদের পরিবারবর্গের নানা কথায় সময় কাটাতেই ভালোবাসে। তা সত্ত্বেও, ভগবদ্ভক্তেরা সত্ত্বগুণে পরিমার্জিত হওয়ার ফলে, সদা সর্বদাই এই ধরনের বদ্ধজীবদের প্রতি কৃপাভরে কিছু করতে আগ্রহী হয়ে থাকে, কারণ এই জীবেরা নিতান্তই ব্যর্থ পশুজীবন যাপন করে। যখন ভগবদ্ভক্তেরা প্রচার করেন যে, মানুষের পক্ষে পশুহত্যা অনুচিত, তখন জড়জাগতিক মনোভাবাপন্ন গৃহস্থেরা প্রায়ই খুব বিস্মিত হয়ে জানতে চায়—যদি তাই করতে হয়, তা হলে নিরামিষ আহারে প্রাণরক্ষা করা বাস্তবিকই সম্ভব কিনা। এইভাবেই সত্ত্বগুণের জাগতিক অভ্যাসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হওয়ার ফলে, ঐ ধরনের অধঃপতিত জড়বাদী মানুষগুলির জীবনে ভগবদ্ভক্তদের কৃপালাভ ব্যতীত উদ্ধারের কোনও আশাই থাকে না।

শ্লোক ৯

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্মণা ।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রিয়া—তাদের সম্পদশ্রী (ধনসম্পত্তি ইত্যাদি) দ্বারা; বিভূত্যা—বিশেষ ক্ষমতাদি; অভিজনেন—অভিজাত বংশমর্যাদা; বিদ্যয়া—শিক্ষাদীক্ষা; ত্যাগেন—ত্যাগ; রূপেণ—রূপ; বলেন—শক্তি; কর্মণা—বৈদিক ক্রিয়াকর্ম; জাত—জন্মলাভ করে; স্ময়েন—এইরকম অহঙ্কারের ফলে; অন্ধ—অন্ধ হয়ে; ধিয়ঃ—যার বুদ্ধি; সহ-ঈশ্বরান্—স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের সাথে; সতঃ—শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ; অবমন্যন্তি—তাঁরা অবমাননা করে; হরি-প্রিয়ান্—ভগবান শ্রীহরির অতীব প্রিয়জনেরা; খলাঃ—খল চরিত্রের মানুষেরা।

অনুবাদ

বিপুল সম্পদ, ঐশ্বর্য, পারিবারিক আভিজাত্য, শিক্ষাদীক্ষা, ত্যাগ, রূপ-সৌন্দর্য, দেহবল এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মে সফল সার্থক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মিথ্যা অহমিকায় খল চরিত্রের মানুষদের বুদ্ধি লোপ পায়। এইরকম বৃথা গর্ববোধের ফলে, খলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর নিন্দামন্দ করতে থাকে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবগণ যে সমস্ত আকর্ষণীয় গুণাবলী অভিব্যক্ত করে, তা সবই মূলত সকল চিত্তাকর্ষক গুণাবলীর আকরস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানেরই করায়ত্ত থাকে। চন্দ্রকিরণ প্রকৃতপক্ষে সূর্যকিরণেরই প্রতিবিম্বিত ঔজ্জ্বল্য মাত্র। তেমনই, ভগবানেরই ঐশ্বর্যসম্পদের সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্য স্বল্প সময়ের জন্য জড় জীবের মাধ্যমে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এই তত্ত্বটি না জেনে, ভগবৎ-বিদ্বেষী মানুষেরা ঐ ধরনের প্রতিফলিত ঐশ্বর্যগুণে প্রমত্ত হয়ে ওঠে, এবং তার ফলে অন্ধ হয়ে, তারা কেবলই শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর নিন্দামন্দ করার মাধ্যমে নিজেদেরই অপযশ সৃষ্টি করে। তারা বুঝতে পারে না যে, কিভাবে তারা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির জীব হয়ে উঠেছে এবং তাই তাদের নরক গমন থেকে নিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য কর্ম।

শ্লোক ১০

সর্বেষু শশ্বত্তনুভৃৎস্ববস্থিতং
যথা খ মাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্ ।
বেদোপগীতং চ ন শৃণ্বতেঽবুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্তয়া ॥ ১০ ॥

সর্বেষু—সকলেরই; শশ্বৎ—চিরকাল; তনূ-ভৃৎসু—দেহধারী জীব; অবস্থিতম্—অবস্থিত থাকে; যথা—যেভাবে; খম্—আকাশ; আত্মানম্—পরমাত্মা; অভীষ্টম্—আরাধ্য; ঈশ্বরম্—পরম নিয়ন্তা; বেদ-উপগীতম্—বেদে প্রশংসিত; চ—এবং; ন শৃণ্বতে—তারা শোনে না; অবুধাঃ—অবোধ মানুষেরা; মনঃ-রথানাম্—যথেচ্ছ সুখ; প্রবদন্তি—তারা আলোচনা করতে থাকে; বার্তায়া—বিষয়াদি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক দেহধারী জীবের অন্তরে নিত্য বিরাজমান থাকেন; তা সত্ত্বেও ভগবান পৃথকভাবেও বিরাজ করেন, ঠিক যেমন আকাশ সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও, কোনও বিশেষ জড় বস্তুর সঙ্গে একেবারে মিশে যায় না। এইভাবেই শ্রীভগবান পরম আরাধ্য এবং সব কিছুরই পরম নিয়ন্তা। বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে তাঁকে বিশদভাবে গুণান্বিত করা হয়েছে, কিন্তু যারা বুদ্ধিভ্রষ্ট, তারা শ্রীভগবান সম্পর্কিত ঐ সব গুণাবলী শুনতেই চায় না। তাদের নিজেদের মানসিক কল্পনাপ্রসূত আলোচনার প্রসঙ্গাদি যা অবধারিতভাবেই মৈথুনাচার এবং আমিষাহারের মতো স্থূল জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সংক্রান্ত কথাবার্তা, সেইগুলি নিয়েই তাদের সময়ের অপব্যয় করা তারা পছন্দ করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।* পরম তত্ত্ব শ্রীভগবানকে অবগত হওয়াই সকল বৈদিক জ্ঞানসম্ভারের লক্ষ্য। বেদশাস্ত্রাদির এই উদ্দেশ্য যদিও সুস্পষ্টভাবেই বৈদিক গ্রন্থাবলীর মধ্যেই এবং আত্মজ্ঞানসম্পন্ন আচার্যবর্গের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও মূর্খ ব্যক্তিরা এই সহজ সত্য বুঝতে পারে না। তাদের মৈথুনসঙ্গীদের নিয়ে মৈথুন অভিজ্ঞতার কথা আলোচনার মাধ্যমে অবৈধ মৈথুনাচার বিষয়ক জ্ঞান চর্চাই তারা পছন্দ করে থাকে। এছাড়া তারা আমিষাহারের লোভে ভাল ভাল রেস্তোরাঁর কথা তাদের বন্ধুদের কাছে সাগ্রহে বর্ণনা করে এবং প্ররোচিত করতে থাকে, আর তাদের পাপাসক্ত অভিজ্ঞতাদির ফলে মাদকাসক্তি ও বিভ্রান্তিকর পরিণামের সবিশদ বর্ণনার মাধ্যমে মাদক দ্রব্যাদি এবং

মদ্যপানের গুণ বর্ণনায় আনন্দ পায়। জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখভোগীরা পরমাগ্রহে পরস্পরকে ফোনে ডেকে নেয়, সংঘসমিতির আড্ডায় জমায়েত হয়, এবং পরম উদ্দীপনায় পশুপাখি শিকার, মদ্যপান এবং জুয়াখেলার সন্ধানে ছুটে চলে, যার ফলে তাদের জীবন অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢেকে যেতে থাকে। পরম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে আলোচনা করবার সময় কিংবা রুচিবোধ, কোনটাই তাদের নেই। দুর্ভাগ্যবশত, তারা পরমেশ্বর ভগবানকে তাচ্ছিল্য করে, তাই তিনি ঐসব নির্বোধ মানুষদের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের কঠোর শাস্তিবিধান করে থাকেন। সব কিছুই ভগবানের সম্পদ এবং সব কিছুই ভগবানেরই উপভোগের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। যখন জীব তার সমস্ত কাজকর্ম শ্রীভগবানের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে সংযোজিত করে, তখনই সে অনন্ত সুখের অধিকারী হতে শেখে। *যেন সত্ত্বং শুদ্ধেদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যম্ ত্বনন্তম্।* বাস্তবিকই, জড়জাগতিক বিষয়াদির মধ্যে কোনই সুখ নেই, এবং মাদকাসক্ত বদ্ধ জীবকে তার প্রকৃত শুদ্ধ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান কৃপাভরে তাদের শাস্তিবিধান করে থাকেন।

দুর্ভাগ্যবশত, *ভগবদ্গীতায়* পরমেশ্বর ভগবান যে পরামর্শ দিয়েছেন, জড়বাদী মানুষেরা তাতে কর্ণপাত করে না কিংবা শ্রীভগবানের প্রতিভূ স্বরূপ যাঁরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো আনুষঙ্গিক শাস্ত্রাদির মাধ্যমে বাণী প্রদান করেছেন, তাও শোনে না। বরং, এই ধরনের ইন্দ্রিয় ভোগীরা নিজেদের জন্য বিষম ধাকচতুর এবং পণ্ডিতাভিমানী মনে করে থাকেন। প্রত্যেক জড়বাদী মানুষই যথার্থভাবে মনে করে থাকে যে, সে বুঝি সবচেয়ে বুদ্ধিমান, এবং তাই পরম তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু শোনবার কোনই সময় তার নেই। তা সত্ত্বেও, এই শ্লোকে বর্ণিত পরমেশ্বর ভগবান বদ্ধ জীবের অন্তরের মাঝে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকেন, এবং তার সঙ্গেই বিরাজমান ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। ঐভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মর্যাদা সম্পর্কে উপলব্ধির প্রয়াস শুরু হয়, যা থেকে বদ্ধ জীবের সর্বপ্রকার শুভ বিকাশ ও সুখ শান্তির সূচনা হতে থাকে।

শ্লোক ১১

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা ।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ ১১ ॥

লোকে—জড় জগতে; ব্যবায়—মৈথুনাসক্তি; আমিষ—আমিষাহার; মদ্য—এবং মদ্যপান; সেবাঃ—গ্রহণ; নিত্যাঃ—সবসময়ে দেখা যায়; হি—অবশ্য; জন্তোঃ—বদ্ধ জীবেদের মধ্যে; ন—না; হি—অবশ্য; তত্র—তাদের বিষয়ে; চোদনা—শাস্ত্রের বিধান; ব্যবস্থিতিঃ—বিধিসম্মত ব্যবস্থা; তেষু—এই সকল বিষয়ে; বিবাহ—পবিত্র বিবাহ সূত্রে; যজ্ঞ—আহুতি সমর্পণ; সুরা-গ্রহৈঃ—এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের সোমরস গ্রহণ; আসু—এই সকল বিষয়ের; নিবৃত্তিঃ—নিবারণ; ইষ্টা—পরম বাঞ্ছা।

অনুবাদ

এই জড়জাগতিক পৃথিবীতে বদ্ধ জীব সর্বদাই মৈথুন অভ্যাস, আমিষ আহার এবং নেশাভাং বিষয়ে প্রবণতা লাভ করে থাকে। অতএব ধর্মশাস্ত্রাদিতে কখনই বস্তুত ঐ ধরনের ক্রিয়াকলাপের উৎসাহ দেওয়া হয় না। যদিও শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদির দ্বারা পবিত্র বিবাহরীতির মাধ্যমে মৈথুনাচারের সুযোগ, যজ্ঞাহুতির মাধ্যমে নিবেদিত পশুমাংসের আহারের রীতি, এবং যজ্ঞশেষে শাস্ত্রসম্মত সোমরস পানের রীতি অনুমোদিত হয়েছে, তবে ঐ সকল অনুষ্ঠানাদি কোনও মতেই নিরাসক্ত বৈরাগ্য সাধনের চরম উদ্দেশ্য সাধনে সহায়করূপে অনুমোদিত হয় না।

তাৎপর্য

যারা শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের স্তরে অবস্থিত নয়, তারা সর্বদাই অবৈধ মৈথুনচর্চা, আমিষ আহার এবং নেশা ভাং অভ্যাসের মাধ্যমে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দিকে সর্বদাই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। ঐ ধরনের জড়জাগতিক মানুষেরা এসব অস্থায়ী ভোগ-উপভোগ বর্জন করতে চায় না, তার কারণ তারা দেহাত্ম বুদ্ধির জালে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই শ্রেণীর মনুষ্যদের জন্য ধর্মানুষ্ঠানের বিবিধ বৈদিক অনুশাসন রয়েছে যার মাধ্যমে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সুযোগ প্রদানের উপায় হয়। তার ফলে বদ্ধ জীব পরোক্ষভাবে বৈদিক জীবনধারায় প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ ইন্দ্রিয় উপভোগের শুদ্ধতা অর্জন করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এইভাবে শুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে জীবমাত্রেই ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়ের রুচিবিকাশের সুযোগ লাভ করে এবং প্রত্যক্ষভাবে শ্রীভগবানের দিব্যপ্রকৃতির অভিমুখে আকৃষ্ট হতে থাকে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেদশাস্ত্রাদির কর্মকাণ্ড অংশের বিভ্রান্ত অনুসরণকারীরা প্রত্যয়বোধ করে যে, বৈদিক উৎসব অনুষ্ঠানাদির জড়জাগতিক ফলাশ্রয়ী কর্মের উদ্যোগ কখনই বর্জন করা উচিত নয়, যেহেতু সেইগুলি ধর্মশাস্ত্রাদির মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি বৈদিক অনুশাসন রয়েছে যে, যথাযথ ঋতুতে পতি অবশ্যই তাঁর পত্নীর ঋতুকালের অন্তত পাঁচদিন পরে রাত্রে পত্নীর

সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবেন, যদি স্ত্রী যথাযথভাবে স্নান সমাপন করে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখেন। এইভাবেই, ধর্মসম্মত মৈথুন জীবনে দায়িত্বসম্পন্ন গৃহস্থেরা অবশ্যই নিয়োজিত হবেন।

মৈথুনজীবন যাপনের উদ্দেশ্যে মানুষ অবশ্যই তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে, সেই অনুশাসন বৈষ্ণব আচার্যবর্গও নিম্নরূপ ভাবধারায় ব্যাখ্যা করেছেন। জড়জগতের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক মানুষই খুব মৈথুনাসক্ত হয়ে থাকে এবং যখনই কোনও সুরূপা নারীর সাক্ষাৎ লাভ করে কিংবা সমস্ত নারীর প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রবলভাবে মৈথুনাসক্ত জীবন উপভোগের বাসনা পোষণ করে থাকে। বাস্তবিকই, সাধারণ জড়জাগতিক কোনও মানুষের পক্ষে তার বিধিসম্মত বিবাহিতা পত্নীর সাথে সংযোগ-সম্পর্ক সাধনের ক্ষেত্রে নিজেকে সংযত করতে পারা সম্ভব হলে, তা অবশ্যই এক ধরনের কৃতিত্ব সাধন বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যেহেতু অন্তরঙ্গতা থেকেই তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাই পত্নীর প্রতি পতি ক্রমশই বিরক্ত কিংবা বিদ্বেষভাবাপন্ন হতে শুরু করে থাকে এবং অন্যান্য নারীদের সাথে অবৈধ সংসর্গ লিপ্সা অনুভব করতে শুরু করে। এই ধরনের মনোবৃত্তি অত্যন্ত পাপপূর্ণ এবং জঘন্য, আর সেই জন্যই বৈদিক শাস্ত্রে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, অবশ্যই সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে যথার্থ পত্নীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যই পতির অগ্রসর হওয়া উচিত, এবং এইভাবেই অন্যান্য নারীদের সাথে অবৈধ মৈথুনাসক্তি উপভোগের প্রবণতা হ্রাস করা চলে। পত্নীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এইভাবে বৈদিক অনুশাসন যদি না থাকত, তা হলে বহু লোক স্বভাবতই তাদের পত্নীদের অবহেলা করত এবং অবৈধ সংযোগের মাধ্যমে অন্যান্য নারীদের কলুষিত করত।

যাইহোক, বদ্ধ জীবগণের উদ্দেশ্যে এই ধরনের অনুশাসন আধ্যাত্মিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত মহাত্মাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না এবং তাঁরা জড়জাগতিক মৈথুন আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে—*নিবৃত্তিরিষ্টা* অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্রাদির যথার্থ উদ্দেশ্যই হল মানুষকে চিন্ময় জগতে নিজ আলয়ে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলেছেন—*যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজতি অন্তে কলেবরম্*—মৃত্যুকালে আমরা যা চিন্তা করি, পরজন্মে আমাদের সেই অনুযায়ী দেহ ধারণ করতে হয়।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ (গীতা ৮/৫)

মৃত্যুর সময়ে কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ সে শ্রীভগবানেরই ভাব অর্জন করে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তার ফলে

শ্রীকৃষ্ণের দিব্যধামের মর্যাদা অর্জন করা যায়। তাই, সেই কারণেই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*), বেদসম্ভারের চরম উদ্দেশ্য কোনও রকমের জড়জাগতিক বৈধ কিংবা অবৈধ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নির্দিষ্ট হয়নি। বিবাহিত মৈথুন জীবনচর্যার বৈদিক বিধিগুলি যথার্থই পাপময় অবৈধ মৈথুনাচার নিবৃত্তির জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছে। অবশ্য, অবোধের মতো সিদ্ধান্ত করা অনুচিত যে, কারও বিবাহিত স্ত্রীর নিরাভরণ শরীরের প্রতি মৈথুনাসক্তি আত্মজ্ঞান উপলব্ধি এবং বৈদিক জ্ঞানচর্চায় উন্নতিলাভের পথে সার্থকতা সাধন করতে পারে। বস্তুত, সকল প্রকার জড়জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারলেই পারমার্থিক জীবনচর্যায় যথার্থ সার্থকসিদ্ধি লাভ করা যায় এবং সকল ভোগতৃপ্তির কবল থেকে বাসনামুক্ত তথা নিবৃত্তি লাভ করা যায় আর তার ফলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মনোনিবেশ করা চলে।

সেইভাবেই, আসবপান এবং আমিষাহার সম্পর্কেও নিয়ন্ত্রিত আচরণবিধি নির্ধারণ করে অন্যান্য অনুশাসনাদি রয়েছে। যারা মাংসাহারে উন্মত্ত, তাদের জন্য বিধান আছে যে, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঁচ শ্রেণীর পঞ্চনখবিশিষ্ট পশু, যথা—গণ্ডার, কচ্ছপ, খরগোশ, শজারু এবং টিকটিকির মাংস ভক্ষণ করতে পারে। তেমনই, বছরের বিশেষ দিনগুলিতে বিশেষ ব্যয় বহুল যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অতি সতর্কভাবে আহুতি প্রদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের আসব পান অনুমোদন করা আছে। এইভাবে, অন্যান্য প্রকার মদ্যাসক্তি এবং নিষ্ঠুর পশুহনন নিষিদ্ধ করা আছে। মানুষ এই ধরনের যজ্ঞাহুতি প্রদানের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শুদ্ধ মানসিকতা অর্জন করতে থাকে, এবং তার ফলে মাংসাহার ও মদ্যপানের মতো নির্বুদ্ধিতার কার্যকলাপ সম্পর্কে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যে সমস্ত বৈদিক নিয়মাদি ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রবৃত্তির নিবারণ করে, সেইগুলিকে *বিধি* বলা হয়। *নিয়ম* বলতে যে সমস্ত অনুশাসনাদি বোঝায়, সেইগুলির মাধ্যমে মানুষকে কিছু অনাবশ্যক কাজকর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বলা হয়ে থাকে—*অহরহঃ সন্ধ্যাম্ উপাসিত*—"প্রত্যেক দিন ত্রিসন্ধ্যা অর্থাৎ তিনবেলা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উচিত।" আরও বলা হয়েছে, *মাঘস্নানং প্রকুর্বিতা*—"শীতকালের দারুণ ঠাণ্ডার সময়েও প্রতিদিন স্নান করতে হবে।" সাধারণত যে সমস্ত কাজ অবহেলিত হয়ে থাকে, সেইগুলির বিধান দেওয়ার জন্য এইরূপ বিধিনিয়মগুলি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যদিও উল্লিখিত বিধিনিষেধাদির মাধ্যমে মানুষের বিধিসম্মত পত্নীকে অবহেলা করার বিষয়ে অনুশাসন ঘোষিত হয়েছে, তবে সম্পূর্ণভাবে মাংসাহারে অবহেলা

করার বিরুদ্ধে কোনও অনুশাসন নেই। পক্ষান্তরে, পশুহনন অতীব জঘন্য কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে, এবং যদিও অত্যন্ত উগ্রপ্রকৃতির মানুষদের জন্য কিছু শিথিলতা গ্রাহ্য করা হয়েছে, তা হলেও এই নিষ্ঠুর কাজ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করাই মানুষের উচিত, কারণ পশুহত্যার যজ্ঞানুষ্ঠানে সামান্যতম অনিয়ম হলেই মানুষের জীবনে বিপর্যয় ঘটে থাকে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশাবলী অনুসারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ-অনুশীলনের মাধ্যমে যারা পারমার্থিক জীবনে সার্থকতা অর্জন করেছে, তারা সম্পূর্ণভাবে জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির প্রবণতা বর্জন করে বলেই আশা করা হয়। যদি কোনও কৃষ্ণভক্ত দ্বিচারিতার মাধ্যমে মাংসাহার, মাদকাসক্তি কিংবা মৈথুন উপভোগ সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় অনুমোদনগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে, তা হলে সে জপ অনুশীলনের বিরুদ্ধে দশম অপরাধ সম্পন্ন করে থাকে: বিশেষ করে যদি ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাস পরিচয়ে বৈরাগ্যের আশ্রমজীবনধারা কেউ স্বীকার করে থাকলে, তাদের পক্ষে গৃহস্থদের জন্য নির্ধারিত বিধিবদ্ধ মৈথুনাচারী জীবনধারার অনুশাসনগুলির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিশেষভাবেই গর্হিত এবং নিন্দনীয় কাজ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, সন্ন্যাস জীবনে এই ধরনের কোনও অব্যাহতি নেই। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা নির্বোধের মতো কখনই বৈদিক শাস্ত্রের বিধানগুলিতে বিভ্রান্ত হবেন না, যেমন *মনুসংহিতা* থেকে নিচের শ্লোকটিতে রয়েছে—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥

"মাংসাহার, মদ্যপান এবং মৈথুনাচার বদ্ধ জীবগণের স্বাভাবিক প্রবণতা বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে, এবং তাই এই ধরনের কার্যকলাপের জন্য এসব মানুষদের নিন্দা করা উচিত নয়। কিন্তু এইরূপ পাপকর্মাদি বর্জন না করলে, কারও পক্ষেই জীবনের যথার্থ সার্থকতা লাভ করা সম্ভব হয় না।"

ক্রিয়াবিধানে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র *বামনদেব* যজ্ঞানুষ্ঠানে, কিংবা ধর্মভাবাপন্ন সুসন্তানাদি লাভের উদ্দেশ্যেই *গর্ভাধান সংস্কার* অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যেই মৈথুনক্রিয়া অনুমোদিত হয়। আরও বলা হয়েছে যে, কয়েক ধরনের মাংস পিতৃপুরুষাদি এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞাদির মাধ্যমে ভগবান শ্রীহরির পূজার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এইভাবেই, সোমরস পানের মাধ্যমে এক প্রকার মাদকতাও লাভ করা যায়। তবে, ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত কোনও মানুষ যদি এই ধরনের নৈবেদ্য আস্বাদনে আগ্রহী হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সে দূষিত চরিত্রের মানুষ রূপে গণ্য হয়ে

থাকে। বাস্তবিকই, যে সকল ব্রাহ্মণেরা এইরূপ নৈবেদ্য উৎসর্গ করে থাকেন, তাঁরা নিজেরা কোনও রকমের মাদক কিংবা মাংস গ্রহণ করেন না। এই সামগ্রীগুলি ক্ষত্রিয়েরাই গ্রহণ করে থাকে, তারই যজ্ঞবিশিষ্ট গ্রহণের ফলে পাপের ভাগী হয়ে থাকে।

যাইহোক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায় যে, কৃষ্ণভক্ত রূপে যাঁরা সার্থকতা অর্জন করতে আগ্রহী হন, তাঁরা অচিরেই এই সমস্ত ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্ম-বর্জন করে থাকেন। শুদ্ধভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের অভিলাষ থাকলে এই ধরনের কোনও প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষী যজ্ঞ নিবেদনের অবকাশ থাকে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ ছিল যে, তাঁর অনুরাগী সমস্ত ভক্ত অনুরাগীদের দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করতেই হবে—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*। যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী হতে ইচ্ছুক এবং অচিরে নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায়, তারা অবশ্যই অবহেলাভরে কোনও বৈদিক ফলাশ্রয়ী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে আকৃষ্ট হবে না যার ফলে তারা জড়জাগতিক দেহাত্মবুদ্ধির জীবনধারায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা সর্বদাই এই সমস্ত দোষযুক্ত যাগযজ্ঞাদি থেকে নিবৃত্ত থাকেন।

শ্লোক ১২

ধনং চ ধর্মৈকফলং যতো বৈ
জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি ।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য
মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্যম্ ॥ ১২ ॥

ধনম্—ধনসম্পদ; **চ**—ও; **ধর্ম-এক-ফলম্**—যার একমাত্র ফললাভ ধর্মপ্রবণতা; **যতঃ**—যা থেকে (ধার্মিক জীবন); **বৈ**—অবশ্য; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **সবিজ্ঞানম্**—প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সঙ্গে; **অনুপ্রশান্তি**—এবং ফলস্বরূপ দুঃখকষ্ট থেকে অব্যাহতি; **গৃহেষু**—তাদের গৃহে; **যুঞ্জন্তি**—তারা উপভোগ করে; **কলেবরস্য**—তাদের জাগতিক দেহের; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **ন পশ্যন্তি**—তারা দেখতে পায় না; **দুরন্ত**—অজেয়; **বীর্যম্**—যে শক্তি।

অনুবাদ

যে ধর্ম থেকে বিজ্ঞান ও মোক্ষসাধক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশ ধর্মকৃত্য সম্পাদনোপযোগী ধনকে যারা কেবলমাত্র আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের জন্য ব্যবহার করে, তাহারা দুরন্তবীর্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না।

তাৎপর্য

যে সকল সামগ্রী কোনও অধিকারীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাদের বলা হয় ধনম্ বা সম্পত্তি। যখন বুদ্ধিহীন কোনও মানুষ তার জাগতিক দেহ এবং পরিবারবর্গের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তার কষ্টোপার্জিত সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করতে থাকে, তখন সে আর মোটেই দেখতে পায় না যে, মৃত্যু কেমন অবধারিতভাবে তার নিজের দেহ, এমনকি তার পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবদের সকলেরই অনিত্য দেহগুলির দিকে এগিয়ে আসছে। *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—পরমেশ্বর ভগবান সর্বশক্তিমান মৃত্যুরূপে সকল জড়জাগতিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনে আবির্ভূত হন। বাস্তবিকই, পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনেও মানুষের নিজের এবং তার নিজ পরিবার-পরিজনদের পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের কল্যাণে তার ধনসম্পদ কাজে লাগানো উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অনেক ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ আছেন, যাঁরা সরল শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন এবং বাড়িতে কৃষ্ণভাবনাময় ক্রিয়াকর্মের আয়োজনের মাধ্যমে তাঁদের সম্পদ কাজে লাগান এবং যে সব সর্বত্যাগী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা জনগণের মাঝে কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করছেন, তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। এই ধরনের গৃহস্থেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে তথা প্রচারে তাদের সমগ্রশক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করতে না পারলেও, জীবনের পারমার্থিক নীতিগুলি সম্পর্কে বেশ সুদৃঢ় উপলব্ধি ক্রমশই আয়ত্ত করতে থাকে এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে দৃঢ়ভাবে ভক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে দিব্যভাবাপন্ন মানুষ হয়ে ওঠে। এইভাবে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি নামে বদ্ধ জীবনের সকল উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করে।

কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন বিনা জীবন বাস্তবিকই দারিদ্র্যে পূর্ণ হয়ে থাকে। তবে দারিদ্রক্লিষ্ট জড়বাদী যে সব মানুষের বুদ্ধি স্বল্প, তারা উপলব্ধি করতেই পারে না যে, কৃষ্ণভাবনামৃত স্বরূপ ভগবৎ-প্রেমের সর্বোচ্চ পর্যায়ে চেতনার বিস্তার করতে পারলেই প্রকৃত সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। এই ধরনের মানুষেরা তাদের ছেলেমেয়েদের যেন ঠিক পশুদের মতোই বড় করে তোলে যাতে তাদের জীবনে একমাত্র লক্ষ্য হয় অনর্থক মানমর্যাদা আর জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগ। এই ধরনের জড়বাদী গৃহস্থেরা ভয় পায় বুঝি পারমার্থিক জীবনচর্যায় অত্যধিক আগ্রহ হলে তাদের সন্তানদের পক্ষে অসার জাগতিক মর্যাদা আহরণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, মৃত্যুই এই সমস্ত আধ্যাত্মিক ভাববর্জিত জড়বাদী মানুষদের সমস্ত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে. যদি গৃহস্থ পরিবারের জীবন ও ধনসম্পদ সবই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে ও প্রচারে প্রয়োগ করা হয়,

তা হলে মানুষ নিত্য এবং অনিত্য, চিন্ময় এবং জাগতিক, আনন্দ ও উৎকণ্ঠার পার্থক্য বিচার করতে শিখবে এবং তার ফলে জীব মুক্তি লাভ করবে এবং নিত্য সত্য কৃষ্ণভাবনাময় জীবনের অনুকূল সর্বোত্তম বিশুদ্ধ আশীর্বাদ লাভের মাধ্যমে নিতান্ত তুচ্ছ তত্ত্বমূলক জ্ঞানের প্রসারতার ফলে সার্বিক সিদ্ধি লাভে সমর্থ হবে। সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবশ্যই পরোক্ষ তত্ত্বমূলক জ্ঞান ছাড়া কার্যকরী হতে পারে না; এই পরোক্ষ জ্ঞান ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে সযত্ন চর্চা-অনুশীলনের মাধ্যমে, যা থেকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ জ্ঞান তথা আত্মতত্ত্বজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে।

এই শ্লোকে *অনুপ্রশান্তি* শব্দটি বোঝায় যে, চিন্ময় জ্ঞান (*বিজ্ঞানম্*) থেকে মানুষ নিত্য আনন্দময় শান্তি লাভের পরম সুখাবস্থা প্রাপ্ত হয়, যা বদ্ধ জড়জাগতিক জীবের স্বপ্নেরও অতীত।

শ্লোক ১৩

যদ্ ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা ।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যা
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্মম্ ॥ ১৩ ॥

যৎ—যেহেতু; ঘ্রাণ—ঘ্রাণ দ্বারা; ভক্ষঃ—গ্রহণ করে; বিহিতঃ—বিধান আছে; সুরায়াঃ—সুরার; তথা—সেইভাবেই; পশোঃ—যজ্ঞের পশুদের; আলভনম্—যথাবিহিত হত্যা; ন—না; হিংসা—যথেচ্ছ হিংসা; এবম্—এইভাবেই; ব্যবায়ঃ—মৈথুন; প্রজয়া—সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে; ন—না; রত্যা—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে; ইমম্—এই (যেভাবে পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে); বিশুদ্ধম্—অতি শুদ্ধ; ন বিদুঃ—তারা বোধ করে না; স্বধর্মম্—তাদের নিজেদের যথার্থ ধর্ম।

অনুবাদ

বৈদিক অনুশাসন অনুসারে, যখন যজ্ঞানুষ্ঠানের উৎসবাদিতে সুরা নিবেদন করা হয়, তা যজ্ঞের পরে ঘ্রাণের মাধ্যমে আস্বাদন করতে হয়, পান করা হয় না। সেইভাবেই, পশুকে আহুতিস্বরূপ নিবেদন করার বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু নির্বিচারে ব্যাপকভাবে প্রাণিহত্যার কোনও ব্যবস্থাই নেই। ধর্মাচরণের মাধ্যমে মৈথুন জীবনযাপনেরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা শুধুমাত্র বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে সন্তানাদির লাভেরই জন্য এবং দৈহিক সুখতৃপ্তি উপভোগের জন্য অনুমোদিত হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত, অবশ্য স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন জড়বাদীরা বুঝতে পারে না যে, শুদ্ধভাবে পারমার্থিক স্তরেই তাদের জীবনধারা পরিচালনা করাই উচিত।

তাৎপর্য

মধ্বাচার্য পশুবলি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—

যজ্ঞেষ্বালভনং প্রোক্তম্ দেবতোদ্দেশতঃ পশোঃ ।
হিংসা নাম তদন্যত্র তস্মাৎ তাং নাচরেদ্ বুধঃ ॥
যতো যজ্ঞে মৃতা ঊর্ধ্বং যান্তী দেবে চ পৈতৃকে ।
অতো লাভাদ্ আলভনম্ স্বর্গস্য ন তু মারণম্ ॥

এই বিবৃতি অনুযায়ী, বেদশাস্ত্রাদি অনেক ক্ষেত্রে ধর্মানুষ্ঠানে পশু বলিদানের বিধান দেওয়া আছে পরমেশ্বর ভগবান বা কোনও বিশেষ দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে। অবশ্য যদি কেউ খেয়ালখুশিমতো বৈদিক অনুশাসনাদি যথাযথভাবে পালন না করে পশুহত্যা করে, তা হলে সেই ধরনের পশুবলিদান প্রকৃতপক্ষে হিংসাত্মক কাজ বলেই গণ্য হয় এবং কোনও বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষেই তা মেনে নেওয়া উচিত হবে না। যদি পশুবলি যথাযথভাবে পালিত হয়, তা হলে বলি প্রদত্ত পশুটি যজ্ঞাহুতির মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের স্বর্গধামে চলে যায়। সুতরাং সেই ধরনের পশুবলি যথার্থ পশু হত্যা নয়, তবে বৈদিক মন্ত্রাবলীর শক্তি প্রদর্শনের জন্য সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়, যার মাধ্যমে বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণের শক্তির মাধ্যমে সেই যজ্ঞপশুটি তৎক্ষণাৎ এক সমুন্নত মর্যাদাসম্পন্ন স্তরে উন্নীত হয়ে যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্য এইভাবে পশু বলি এই যুগে নিষিদ্ধ করেছেন, যেহেতু যথাযথভাবে মন্ত্রাদি উচ্চারণে পারদর্শী কোনও ব্রাহ্মণই আজকাল নেই, এবং পশুযজ্ঞে আহুতি প্রদানের জায়গা বলতে যেটি আজকাল নির্ধারিত হয়ে থাকে, সেটি সাধারণত কসাইখানায় পরিণত হয়েছে। আর পূর্ববর্তী যুগে, যখন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিকৃত ব্যাখ্যা সহকারে মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, পশুহত্যা এবং মাংসাহার বিধিসম্মত, তখন ভগবান শ্রীবুদ্ধ স্বয়ং আবির্ভূত হন এবং তাদের গর্হিত পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে শ্রীল জয়দেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধে—রহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

দুর্ভাগ্যবশত, বদ্ধ জীবগণ যে চারটি অপূর্ণতার হীনতাদুষ্ট, সেইগুলির মধ্যে অন্যতম প্রতারণা, এবং তার ফলেই, তারা শ্রীভগবানের কৃপাশীর্বাদ স্বরূপ তাদের

ক্রমান্বয়ে উন্নতিবিকাশের উদ্দেশ্যে যে সকল ধর্মশাস্ত্রাদির মাধ্যমে সুবিধামূলক সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বিকৃতভাবে স্বার্থ সাধনে কাজে লাগিয়ে থাকে। একই সঙ্গে তাদের ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি সাধনের সঙ্গে তাদের পারমার্থিক উন্নতিবিধানের সুযোগ সমন্বিত বৈদিক অনুশাসনগুলি অনুসরণ করে চলার চেয়ে, বদ্ধ জীবগণ সেই অনুশাসনগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝে, জড়জাগতিক উৎসবাদি বর্জনের পরামর্শ অনুসরণ করতে থাকে এবং তার ফলে ক্রমশই তারা কেবলই দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীবনধারার অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত তথা অধঃপতিত হতেই থাকে। এইভাবেই তারা মূল বর্ণাশ্রম প্রথা থেকেই অধঃপতিত হয় এবং উগ্র বেদবিরোধী সমাজ ব্যবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, সেই সকল পরিবেশের মধ্যে প্রচলিত সর্বজনীন ধর্মনীতিগুলির যৎসামান্য অংশগুলিকেই আত্মার একান্ত ধর্ম বলে ধারণা পোষণ করে। এই ধরনের হতভাগ্য মানুষগুলি তাদের জীবনে নিত্যসিদ্ধ শাশ্বত করণীয় কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে একেবারেই সম্পর্কছিন্ন হয়ে সব কিছুকেই বাস্তব থেকে বিপুলভাবে ভিন্ন বস্তু রূপে ধারণা করতে থাকে।

শ্লোক ১৪

যেত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥ ১৪ ॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **অনেবম্-বিদঃ**—এই সকল তথ্য না জেনে; **অসন্তঃ**—অতি অসাধু; **স্তব্ধাঃ**—অজ্ঞতাবশত; **সৎ-অভিমানিনঃ**—নিজেদের সাধু মনে করে; **পশূন্**—পশুগণ; **দ্রুহ্যন্তি**—তারা ক্ষতি করে; **বিশ্রব্ধাঃ**—নির্দোষ বিশ্বাসী; **প্রেত্য**—বর্তমান শরীর ত্যাগের পরে; **খাদন্তি**—তারা খায়; **তে**—ঐ পশুগুলি; **চ**—এবং; **তান্**—তাদের।

অনুবাদ

সেই সমস্ত পাপাচারী মানুষ যথার্থ ধর্মনীতি বিষয়ে অজ্ঞ হলেও নিজেদের সম্পূর্ণ ধার্মিক মনে করে, তাই নির্বিচারে ঐ সব নিরীহ পশু যারা তাদের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে থাকে, তাদের উপর হিংসাত্মক আচরণ করে থাকে। তাদের পরজন্মে, এই সমস্ত পাপাচারী মানুষগুলিকে এই পশুগুলিই আবার হত্যা করে ভক্ষণ করে থাকে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর বিধিনিয়মাদির প্রতি যে সব মানুষ আত্মসমর্পণ করে না, তাদের মধ্যে কত বিরাট

অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে। তাই *ভাগবতে* বলা হয়েছে—*হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ*—যারা পরমেশ্বর ভগবানের পরম শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে না, ক্রমশই তারা চরম পাপময় প্রবৃত্তির বশীভূত হতে থাকে, যার পরিণামে অভক্ত মানুষদের জীবনে ভয়ানক দুঃখকষ্ট নেমে আসে। আমেরিকা, ইউরোপের মতো দেশগুলিতে, অনেক লোক বিশেষ গর্বভরে নিজেদের অতি নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ মানুষ বলে এবং অনেক সময়ে অবতার কিংবা ভগবানের প্রতিনিধি বলেও আত্মপ্রচার করে থাকে। তাদের ধর্মভাবের গর্ব প্রকাশের মাধ্যমে, এই ধরনের নির্বোধ মানুষগুলি কসাইখানাগুলিতে অগণিত পশুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার সময়ে কোনও ভয় কিংবা দ্বিধা অনুভব করে না কিংবা তাদের খেয়াল খুশিমতো ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের জন্য পশুপাখি শিকারের প্রমোদ-অভিযানে যেতেও ইতস্তত করে না। আমেরিকা মহাদেশেও মিশিসিপি রাজ্যে মাঝে মাঝে শূকর বধের উৎসব হয়ে থাকে, যেখানে স্থানীয় সমস্ত পরিবারবর্গের মানুষেরা জমায়েত হয়ে তাদের চোখের সামনে একটি শূকরকে নিষ্ঠুরভাবে নানা কৌশলে অনেকক্ষণ ধরে হত্যা করবার অনুষ্ঠান উপভোগ করতে থাকে। ঠিক তেমনই, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো মহান দেশ বলে জগদ্বিখ্যাত রাষ্ট্রের পূর্বতন এক রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেন্ট) সেখানকার টেকসাস্ রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে এসে মনে করতেন যে, একটি গাভীকে কোনও উৎসবের মাঝে কসাই না করা হলে নাকি সেই উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে না। এই ধরনের মানুষগুলি শ্রীভগবানের কল্যাণকর বিধিনিয়মাদি যথাযথভাবে পালন করে চলেছে বলে সর্বসমক্ষে নির্লজ্জভাবে জাহির করে থাকে এবং তাদের এই ধরনের গর্বোদ্ধত নির্বুদ্ধিতার পরিণামেই বাস্তব সত্যের সঙ্গে সর্বপ্রকার শুভ সংযোগ তারা হারিয়ে ফেলতে থাকে। যখন কেউ একটি প্রাণীকে হত্যা করবার মতলবে তাকে পালন করতে থাকে, তখন সে তাকে খুব ভালভাবে খেতে দেয় এবং হৃষ্টপুষ্ট করে তোলার জন্য উৎসাহ দেয়। তাই পশুটি ক্রমশ তার ভবিষ্যৎ হত্যাটিকেই তার রক্ষাকর্তা এবং প্রভু মনে করতে থাকে। যখন শেষ পর্যন্ত সেই মনিবটি হতভাগ্য পশুটির দিকে ধারালো ছুরি কিংবা বন্দুক নিয়ে এগুতে থাকে, তখন পশুটি ভাবে, "আহা, আমার প্রভু আমার সঙ্গে তামাসা করছে।" একেবারে শেষ মুহূর্তে পশুটি বোঝে যে, যাকে সে প্রভু মনিব মনে করেছিল, সে মূর্তিমান মৃত্যু। বৈদিক শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশুদের নিষ্ঠুর মনিবেরা যারা নির্দোষ প্রাণীদের হত্যা করে, নিঃসন্দেহে পরজন্মে তারা একই পদ্ধতিতে নিহত হবে।

মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসম্ ইহাদ্যাহম্ ।
এতন্ মাংসস্য মাংসত্বম্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

" 'এখানে যে পশুটির মাংস আমি এখন ভক্ষণ করছি, পরজন্মে সে আমার মাংস আহার করবে।' এই জন্যই পশুদেহ ভক্ষণকে 'মাংস' রূপে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রকারেরা বর্ণনা করছেন।" *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রাণিহত্যাকারীদের এই ভয়ানক দুর্ভাগ্যের কথা একদা যজ্ঞাদিতে নিবেদনের নামে এইভাবে যথেচ্ছ পশুহত্যাকারী রাজা প্রাচীনবর্হিকে শ্রীনারদ মুনি বর্ণনা করেছিলেন।

ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে ।
সংজ্ঞাপিতান্ জীবসংঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ ॥
এতে ত্বাং সম্প্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব ।
সম্পরেতম্ অয়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ ॥

"হে প্রজাপালক রাজা, অনুগ্রহ করে আকাশমার্গে লক্ষ্য করে দেখুন—যে সমস্ত পশুদের আপনি নির্বিচারে এবং নির্দয়ভাবে যজ্ঞস্থলে বলি দিয়েছেন। এই সমস্ত পশুরা আপনার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রয়েছে যাতে আপনি তাদের উপরে যে আঘাত হেনেছেন, তার প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করতে পারে। আপনার মৃত্যু হলে, তারা ক্রুদ্ধভাবে তাদের লৌহময় শৃঙ্গ দ্বারা আপনার দেহ ছিন্নভিন্ন করবে।" (*ভাগবত* ৪/২৫/৭-৮) মৃত্যুর অধিপতি যমরাজের গ্রহলোকে তাঁর ব্যবস্থাধীনে পশুহনন-কারীদের জন্য এই ধরনের শাস্তিবিধান হতে পারে। পক্ষান্তরে, কোনও পশুকে যে বধ করে কিংবা যে মাংস ভক্ষণ করে, নিঃসন্দেহে যে জীবটি তার দেহটিকে ভক্ষণের জন্য মাংসাহারীর পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে হয়েই থাকে। মাংসাহারীকে অবশ্যই তার নিজের দেহের মাংস আহারের জন্য প্রত্যর্পণ করে পরজন্মে তার ঋণ শোধ করতেই হয়। এইভাবে নিজের দেহটিকে মাংসরূপে আহারের জন্য প্রত্যর্পণের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের বিধান বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

শ্লোক ১৫

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্ ।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১৫ ॥

দ্বিষন্তঃ—দ্বেষবশতঃ; **পরকায়েষু**—অন্যের শরীরের মধ্যে অবস্থিত (আত্মা); **স্ব-আত্মানম্**—তাদের নিজেদের যথার্থ আত্মপরিচিতি; **হরিম্-ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **মৃতকে**—মৃতদেহে; **স-অনুবন্ধে**—তার সম্বন্ধ সম্পর্কের সঙ্গে; **অস্মিন্**—এই; **বদ্ধস্নেহাঃ**—তাদের সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন; **পতন্তি**—তাদের পতন হয়; **অধঃ**—নিম্নগামী।

অনুবাদ

বদ্ধজীবগণ সুদৃঢ় স্নেহবন্ধনে তাদের নিজেদেরই মৃতদেহবৎ জড় শরীরটির সাথে এবং তাদের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গের সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই ধরনের মহানন্দময় এবং বুদ্ধিভ্রষ্ট অবস্থায়, বদ্ধ জীবগণ অন্য সকল জীব, এমন কি সকল জীবের অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রতিও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। তার ফলে ঈর্ষাবশে সকলকে মনোকষ্ট দেওয়ার ফলে, বদ্ধজীবগণ ক্রমশই নরকে অধঃপতিত হতে থাকে।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক মানুষেরা নিষ্ঠুরভাবে পশুহত্যার মাধ্যমে তাদের ঈর্ষাবোধ অভিব্যক্ত করে থাকে। তেমনই, বদ্ধ জীব অন্যান্য মানুষদের প্রতিও ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকে, এমনকি প্রত্যেকের মধ্যে বিরাজমান স্বয়ং শ্রীভগবানের প্রতি ঈর্ষাবোধ করতে থাকে। প্রত্যেক জীবই শ্রীভগবানের নিত্যদাস, এই তত্ত্ব সম্পর্কে তারা পরিহাস প্রকাশ করে এবং নিরীশ্বরবাদী বিজ্ঞান তথা *ভূয়োদর্শী* প্রচারের মাধ্যমে তারা শ্রীভগবানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে থাকে। এই ধরনের ঈর্ষাজর্জরিত মানুষেরাই যুদ্ধবিগ্রহ বাধিয়ে, আতঙ্কবাদ ছড়িয়ে, নির্মম রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করে এবং প্রতারণামূলক ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোগ সৃষ্টির সাহায্যে অন্যান্য সকল মানুষের প্রতি তাদের তিক্ত মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। এই ধরনের ঈর্ষাবিষজর্জরিত মানুষদের পাপপঙ্কিল দেহগুলি ঠিক যেন মৃতশরীরেরই মতো হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও, ঈর্ষাপূর্ণ মানুষেরা তাদের জড়জাগতিক দেহটির মৃতবৎ শারীরিকরূপ নিয়েই আত্মপ্রশংসামুখর হয়ে থাকে এবং তাদের সন্তানাদি ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের বিষয়ে আনন্দোচ্ছল হয়ে জীবন যাপন করে। *বৃথা অহম্* বোধের ফলেই এই ধরনের মনোবৃত্তি জাগে। শ্রীল মধ্বাচার্য *হরিবংশ* থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

আপ্তবাদ আত্মশব্দোক্তং স্বস্মিন্নপি পরেষু চ ।
জীবাদন্যং ন পশ্যন্তি শ্রুত্বৈবং বিদ্বিষন্তি চ ।
এতানসুরান্ বিদ্ধি লক্ষণৈঃ পুরুষাধমান্ ॥

"পরমপুরুষকে আত্মা বলা হয় কারণ তিনি এক এবং বহুর মধ্যেও বিরাজ করে থাকেন। কিছু মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের বর্ণনাদি শ্রবণ করলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, এবং তারা প্রকাশ্যে বলে থাকে যে, তারা ছাড়া অন্য কোনও পরম সত্তা থাকতেই পারে না। এই ধরনের মানুষদের অসুর বলেই জানতে হবে। তাদের বাস্তব লক্ষণাদি বিচারের মাধ্যমেই বুঝে নিতে হয় যে, তারা সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ।"

শ্লোক ১৬

যে কৈবল্যমসম্প্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্ ।
ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে ॥ ১৬ ॥

যে—যারা; কৈবল্যম্—পরম তত্ত্বের জ্ঞান; অসম্প্রাপ্তাঃ—অর্জন না করে; যে—যারা; চ—ও; অতীতাঃ—অতীত; চ—ও; মূঢ়তাম্—সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা; ত্রৈবর্গিকাঃ—ধর্ম, অর্থ ও কাম রূপে জীবনের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনে; হি—অবশ্য; অক্ষণিকাঃ—এক মুহূর্তও চিন্তার সময় না থাকায়; আত্মানম্—তাদের নিজ সত্তা; ঘাতয়ন্তি—হন্তা; তে—তাদের।

অনুবাদ

যারা পরম তত্ত্বজ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়নি, অথচ সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার অন্ধকার অতিক্রম করেছে, তারা সাধারণত ধর্ম, অর্থ ও কাম নামে অভিহিত পুণ্য পবিত্র জড়জাগতিক জীবনযাপনের ত্রিবিধ মার্গ অনুসরণ করে থাকে। অন্য কোনও প্রকার উচ্চ পর্যায়ের উদ্দেশ্য সাধনে ভাবনাচিন্তা করবার মতো সময় তারা পায় না বলেই আপনার আত্মার শুদ্ধতা হননকারী জীব হয়ে যায়।

তাৎপর্য

যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত থাকে এবং তার ফলে জড়জাগতিক ধর্মজীবন যাপনেরও অবকাশ পায় না, তারা অসংখ্য পাপকর্ম করতে থাকে এবং অত্যন্ত কষ্টভোগ করে। এই ধরনের বিষম কষ্টভোগের ফলে এই শ্রেণীর মানুষেরা অনেক সময়ে ভগবদ্ভক্তদের শরণাগত হয় এবং সেইভাবে দিব্য সঙ্গ লাভের মাধ্যমে আশীর্বাদধন্য হয়ে উঠে, অনেক ক্ষেত্রেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সর্বোত্তম সিদ্ধির পর্যায়ে উন্নতি লাভ করে।

যারা পরিপূর্ণভাবে পাপাচারী নয়, তারা জড়জাগতিক জীবনধারার দুঃখকষ্টের কিছুটা লাঘব হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তার ফলে জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধের অলীক অনুভূতি সৃষ্টি করে নিয়ে থাকে। যেহেতু জড়জাগতিক পুণ্যবান লোকেরা সাধারণত পৃথিবীতে সমৃদ্ধি, দৈহিক সৌন্দর্য এবং সুখের সাংসারিক গৃহপরিবেশ লাভ করে থাকে, তাই তারা তাদের মর্যাদা-পরিবেশে মিথ্যা গর্ববোধ করে এবং ভগবদ্ভক্তদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ কিংবা তাদের সঙ্গলাভে আগ্রহবোধ করে না। দুর্ভাগ্যবশত, পুণ্য বা পুণ্যহীন সমস্ত জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপই অবধারিতভাবে পাপময় কাজকর্মের দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়ে। যারা তাদের পবিত্রতা সম্পর্কে গর্ববোধ করে এবং কৃষ্ণকথা শুনতে পছন্দ করে না, তাদের কৃত্রিম মর্যাদা থেকে আজ নয় কাল তারা অবশ্যই অধঃপতিত হয়। প্রত্যেক

জীব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যদাস। সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণের কাছে আমরা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত, আমাদের বাস্তবিকই অধর্ম হতেই থাকে। *অক্ষণিকাঃ* (ক্ষণমাত্রও চিন্তাভাবনার অবকাশশূন্য) শব্দটি এই শ্লোকে তাৎপর্যপূর্ণ। জড়জাগতিক ভাবাপন্ন মানুষেরা তাদের নিত্যকালের আত্ম-উপলব্ধির জন্য একটি মুহূর্তও ব্যয় করতে পারে না। এটা দুর্ভাগ্যেরই লক্ষণ মাত্র। এই ধরনের মানুষেরা তাদের অবাধ্যতার ফলে নিজেদেরই আত্মাকে হনন করতে থাকে এবং পরিণামে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে, তা থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ তারা মুক্তিলাভ করে না।

অসুস্থ মানুষ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডাক্তারের যত্নের প্রাথমিক ফললাভে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যদি রোগী প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্যোন্নতির লক্ষণে অযথা গর্ববোধ করতে থাকে এবং ডাক্তারের আদেশ-নির্দেশগুলি অসময়ে আগে থেকেই বর্জন করে নিজেকে ইতিমধ্যেই সুস্থ বলে মনে করে, তা হলে নিঃসন্দেহে আবার রোগ ফিরে আসবেই। *যে কৈবল্যমসম্প্রাপ্তাঃ* শব্দসমষ্টি দ্বারা এই শ্লোকটিতে পরিষ্কার বোঝানো হয়েছে যে, জাগতিক দান-ধ্যানের পুণ্যকর্ম থেকে পরমতত্ত্বের শুদ্ধজ্ঞান লাভের পথ বহু দূরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আশ্রয়লাভের আগেই কেউ যদি তার পারমার্থিক জীবনে উন্নতিলাভের প্রয়াস স্তব্ধ করে দেয়, তা হলে, তার জীবনে ব্রহ্মজ্যোতির নিরাকার নির্বিশেষবাদী উপলব্ধি লাভ হয়ে থাকলেও, অবধারিতভাবেই অতীব অশান্তিপূর্ণ জাগতিক পরিস্থিতির মধ্যে তাকে অধঃপতিত হতে হবে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ।*

শ্লোক ১৭

এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ ।
সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ ॥ ১৭ ॥

এতে—এই সকল; **আত্ম-হনঃ**—আত্মহননকারী; **অশান্তাঃ**—শান্তিবর্জিত; **অজ্ঞানে**—অজ্ঞানতাবশত; **জ্ঞানমানিনঃ**—জ্ঞানী মনে করে; **সীদন্তি**—তারা কষ্ট পায়; **অকৃত**—কৃতকার্যে ব্যর্থ; **কৃত্যাঃ**—তাদের কর্তব্য; **বৈ**—অবশ্য; **কাল**—সময়ে; **ধ্বস্ত**—বিধ্বংস; **মনঃ-রথাঃ**—তাদের মনোবাঞ্ছা।

অনুবাদ

আত্মহননকারী জীব কখনই সুখী হয় না, কারণ তারা মনে করে যে, জড়জাগতিক জীবনধারা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যেই মূলত মানুষের বুদ্ধি কাজে লাগাতে হয়।

তাই যথার্থ চিন্ময় পারমার্থিক কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করে তারা সর্বদা দুঃখভোগ করতেই থাকে। বিপুল আশা এবং স্বপ্নে তারা পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিয়তই এই সব কিছুই কালের দুর্দমনীয় পদক্ষেপে ধ্বংস হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এই ধরনের একটি শ্লোক *শ্রীঈশোপনিষদে* (৩) রয়েছে—

অসুর্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥

"আত্মহননকারী যে কেউ হোক, তাকে অবশ্যই অন্ধকার ও অজ্ঞানতায় পূর্ণ অবিশ্বাসীদের গ্রহমণ্ডলীতে প্রবেশ করতে হয়।"

শ্লোক ১৮

হিত্বাত্মমায়ারচিতা গৃহাপত্যসুহৃৎস্ত্রিয়ঃ ।
তমো বিশন্ত্যনিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১৮ ॥

হিত্বা—ত্যাগ করে; আত্ম-মায়া—পরমাত্মার মায়াশক্তির দ্বারা; রচিতাঃ—সৃষ্ট; গৃহ—ঘর; অপত্য—সন্তানাদি; সুহৃৎ—বন্ধুরা; স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রীগণ; তমঃ—তমোগুণের মধ্যে; বিশন্তি—তারা প্রবেশ করে; অনিচ্ছন্তঃ—কোনও ইচ্ছা না করেও; বাসুদেব-পরাঙ্মুখাঃ—যারা ভগবান শ্রীবাসুদেবের কাছ থেকে বিমুখ হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবান্বিত হয়ে যারা পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি বিমুখ হয়ে রয়েছে, তার পরিণামে তারা বাধ্য হয়ে তাদের ঘরবাড়ি, সন্তানাদি, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী-প্রেমিকা বলতে যা কিছু বোঝায়, পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট সেই সব কিছুই তারা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গভীর তমসাময় প্রদেশে তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রবিষ্ট হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

বদ্ধজীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকে এবং তার পরিবর্তে অনিত্য ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টা করে। তার পরিণামে কেবলই উদ্বেগ সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেহেতু বদ্ধজীব তার অনিত্য স্ত্রীপুত্রকন্যা-বন্ধুবান্ধব-ঘরবাড়ি-জাতিপাতি ইত্যাদি প্রতিপালনের জন্যই সংগ্রাম করে চলে। শেষ পর্যন্ত এই সব কিছুই কেড়ে নেওয়া হয়, এবং নিদারুণ হতাশা-বিষাদে বিভ্রান্ত জীবাত্মা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রীভগবানের নির্বিশেষ নিরাকার তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে মুক্তি খোঁজে। এইভাবেই

বদ্ধজীব সর্বদাই অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকে, কখনও মায়াময় ইন্দ্রিয় উপভোগের চেষ্টা করে কিংবা কখনও-বা ব্রহ্ম নামে নিরাকার ভগবৎ তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় উপভোগ বর্জনের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু পরমেশ্বর তথা পরমপুরুষ যিনি জীবের প্রভু, তাঁর সেবারত থাকতে চেষ্টা করাই জীবের যথার্থ মর্যাদা। আর পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বৈরী মনোভাব যতক্ষণ না বর্জন করতে পারছে, ততক্ষণ জীবনে সুখ শান্তির কোনও আশাই কেউ করতে পারে না।

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলি 'অশান্ত' ॥

(*চৈঃচঃ মধ্য* ১৯/১৪৯)

শ্লোক ১৯

শ্রীরাজোবাচ

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **কস্মিন্**—কোন; **কালে**—সময়ে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কিম্ বর্ণঃ**—কোন বর্ণের; **কীদৃশঃ**—কি ধরনের; **নৃভিঃ**—মানুষের দ্বারা; **নাম্না**—কোন নামে; **বা**—এবং; **কেন**—কিভাবে; **বিধিনা**—প্রক্রিয়ায়; **পূজ্যতে**—পূজিত হন; **তৎ**—তা; **ইহ**—আমাদের কাছে; **উচ্যতাম্**—কৃপা করে বলুন।

অনুবাদ

নিমিরাজ প্রশ্ন করলেন, বিভিন্ন যুগের প্রত্যেকটিতে পরমেশ্বর ভগবান কি কি বর্ণে এবং কোন কোন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন, এবং কি কি নামে ও কি ধরনের বিধিনিয়মাদি সহকারে মানব সমাজে শ্রীভগবান পূজিত হন?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকাবলীর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন না করলে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে নিয়োজিত না হলে, মানব জীবন ব্যর্থ হয়। অতএব রাজা এখন ঋষিবর্গের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন যেন তাঁরা শ্রীভগবানের পূজা অর্চনার সুনির্দিষ্ট বিশদ প্রণালী বর্ণনা করেন, কারণ বদ্ধ জীবগণের উদ্ধারের জন্য সেটাই একমাত্র বাস্তব উপায় স্বরূপ সুস্পষ্টভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

শ্রীকরভাজন উবাচ

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ ২০ ॥

শ্রীকরভাজনঃ উবাচ—শ্রীকরভাজন বললেন; কৃতম্—সত্য; ত্রেতা—ত্রেতা; দ্বাপরম্—দ্বাপর; চ—এবং; কলিঃ—কলি; ইতি—এই নামে; এষু—এই সকল যুগে; কেশবঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকেশব; নানা—বিবিধ; বর্ণ—গাত্রবর্ণে; অভিধা—নামে; আকারঃ—এবং আকৃতিতে; নানা—বিবিধ; এব—একই ভাবে; বিধিনা—প্রক্রিয়ায়; ইজ্যতে—পূজিত।

অনুবাদ

শ্রীকরভাজন উত্তর দিলেন— সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই প্রত্যেকযুগে ভগবান শ্রীকেশব নানাবর্ণে, নামে এবং আকারে আবির্ভূত হন এবং সেইভাবে বিবিধ প্রক্রিয়ায় আরাধ্য হয়ে থাকেন।

শ্লোক ২১

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্ দণ্ডকমণ্ডলূ ॥ ২১ ॥

কৃতে—সত্যযুগে; শুক্লঃ—শ্বেত; চতুঃ-বাহুঃ—চতুর্ভুজ; জটিলাঃ—জটাধারী; বল্কলা-অম্বরঃ—গাছের ছালের পোশাক; কৃষ্ণ-অজিন—কৃষ্ণবর্ণের হরিণের চামড়া; উপবীত—ব্রাহ্মণের পৈতা; অক্ষান্—অক্ষ বীজের জপমালা; বিভ্রৎ—বহন করে; দণ্ড—লাঠি; কমণ্ডলূ—এবং জলপাত্র।

অনুবাদ

সত্যযুগে ভগবান শ্বেতবর্ণ ও চতুর্ভুজরূপে জটাধারী বল্কলপরিহিত হন। তিনি কৃষ্ণহরিণের চর্ম, পবিত্র উপবীত, জপমালা, দণ্ড ও ব্রহ্মচারীর কমণ্ডলূ বহন করেন।

শ্লোক ২২

মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥ ২২ ॥

মনুষ্যাঃ—মানুষ; তু—এবং; তদা—তখন; শান্তাঃ—শান্ত প্রকৃতির; নির্বৈরাঃ—ঈর্ষাবর্জিত; সুহৃদঃ—সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন; সমাঃ—সুস্থির; যজন্তি—তারা

আরাধনা করে; তপসা—তপস্যার মাধ্যমে; দেবম্—পরমেশ্বর ভগবান; শমেন—মনঃসংযোগের দ্বারা; চ—এবং; দমেন—বহিরিন্দ্রিয়াদি সংযমের মাধ্যমে; চ—এবং।

অনুবাদ

সত্যযুগে মানুষ শান্ত প্রকৃতিসম্পন্ন, ঈর্ষাবর্জিত, সর্বজীবে মিত্রভাবাপন্ন এবং সর্ব বিষয়ে সুস্থির থাকে। শুদ্ধ তপস্যা এবং বহিরিন্দ্রিয়াদি ও অন্তরিন্দ্রিয়াদি সংযমের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

সত্যযুগে পরমেশ্বর ভগবান পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত চতুর্ভুজ ব্রহ্মচারী রূপে আবির্ভূত হন এবং স্বয়ং ধ্যান প্রক্রিয়া প্রবর্তন করেন।

শ্লোক ২৩

হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ২৩ ॥

হংসঃ—দিব্য হংস; সুপর্ণঃ—অতি সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট; বৈকুণ্ঠঃ—চিন্ময়ধামের অধিপতি; ধর্মঃ—ধর্মরাজ; যোগ-ঈশ্বরঃ—সকল যোগ সাধনার অধিপতি; অমলঃ—নির্মল; ঈশ্বরঃ—পরম নিয়ন্তা; পুরুষঃ—পরম ভোক্তা পুরুষ; অব্যক্তঃ—অপ্রকাশিত; পরম-আত্মা—প্রত্যেক জীবের অন্তরস্থিত পরমাত্মা; ইতি—এইভাবে; গীয়তে—তাঁর নাম নানাভাবে গীত হয়।

অনুবাদ

শ্রীভগবান সত্যযুগে হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত এবং পরমাত্মা নামে মহিমান্বিত হন।

তাৎপর্য

শ্রীভগবানের অবতারত্বের বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিদেহরাজ নিমির প্রশ্নাবলীর উত্তর দিচ্ছেন করভাজন মুনি। সত্য যুগে শ্রীভগবানের দেহ শ্বেতবর্ণ হয়ে থাকে, এবং তিনি বৃক্ষের বল্কল এবং কৃষ্ণ হরিণ চর্ম পরিধান করে আদর্শ ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মচারীরূপে বিরাজ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সত্যযুগে শ্রীভগবানের বিভিন্ন নামের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরা জানেন, পরমাত্মাই পরমেশ্বর শ্রীভগবানের পরম তত্ত্ব। যে সকল পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্মব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরা শ্রীভগবানের এই হংস অবতারত্ব সকল বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে বিরাজিত বলে মনে করেন। স্থূল জড় বিষয়ে মগ্ন মানুষেরা তাঁকে *সুপর্ণ*, "সুশ্রী পক্ষবিশিষ্ট" ধারণায় *ছান্দোগ্য উপনিষদে* বর্ণিত ভাবানুসারে

আত্মার সূক্ষ্ম আকাশের মাঝে বিচরণশীল কার্যকারণের ভিত্তিতে উপলব্ধি করে থাকেন। শ্রীভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্ট সূক্ষ্ম এবং স্থূল পদার্থের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিচরণে অভ্যস্ত মানুষেরা তাঁর বৈকুণ্ঠ নাম জপ করেন। পারমার্থিক ধ্যান ধারণার শক্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে যারা ধর্মমার্গ থেকে পতনোন্মুখ হয়, তারা তাঁকে ধর্মের প্রতিমূর্তিরূপে মহিমান্বিত করে। যারা জড়া প্রকৃতির মায়াময় গুণাবলীর অধীনে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে এবং যাদের মন অনিয়ন্ত্রিত ও বিপর্যস্ত হয়েছে, তারা তাঁকে সর্বার্থ সাধক আত্মস্থ যোগেশ্বর রূপে বন্দনা করে থাকে। রজোগুণ এবং তমোগুণের সংমিশ্রণে যারা প্রভাবান্বিত, তারা তাঁকে অমল অর্থাৎ নির্মলভাবে স্বীকার করে থাকে। তেজোহীন মানুষেরা তাঁকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করে, এবং যারা তাঁকে নিজেদের আশ্রয়কর্তা বলে বিবেচনা করে থাকে, তারা তাঁকে উত্তমপুরুষ নামে জপ সাধনা করে থাকে। এই জড়জাগতিক অভিব্যক্তিকে যারা নিতান্তই অনিত্য অস্থায়ী বলে জানে, তারা তাঁকে অব্যক্ত বলে অভিহিত করে। এইভাবে, সত্যযুগে ভগবান শ্রীবাসুদেব বিবিধ চতুর্ভুজ দিব্যরূপে আবির্ভূত হন, এবং জীবাত্মাগণ তাঁকে প্রত্যেকটি বিশেষ দিব্যরূপের আকারে ভক্তিসেবা অনুশীলনের মাধ্যমে আরাধনা করে থাকে। এইভাবেই পরমেশ্বর ভগবান বহু বিবিধ নাম ধারণ করে বিরাজ করেন।

শ্লোক ২৪

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৪ ॥

ত্রেতায়াম্—ত্রেতা যুগে; **রক্তবর্ণঃ**—লোহিত বর্ণের; **অসৌ**—তিনি; **চতুর্বাহুঃ**—চতুর্ভুজ; **ত্রিমেখলঃ**—তিনটি কোমরবন্ধ পরিহিত (বৈদিক দীক্ষার তিনটি পর্যায়ের অভিব্যক্তি); **হিরণ্যকেশঃ**—সোনালী কেশ; **ত্রয়ী-আত্মা**—তিনটি বেদের জ্ঞানসম্ভারের প্রতিমূর্তি; **স্রুক্-স্রুব-আদি**—যজ্ঞে ব্যবহৃত চামচ, হাতা ইত্যাদি উপকরণ; **উপলক্ষণঃ**—তাঁর প্রতীকাদি স্বরূপ।

অনুবাদ

ত্রেতাযুগে শ্রীভগবান রক্ত দেহবর্ণে আবির্ভূত হন। তাঁর চতুর্ভুজ, স্বর্ণবর্ণ কেশরাজি থাকে এবং তিনটি বেদশাস্ত্রের প্রত্যেকটিতে দীক্ষিত হওয়ার লক্ষণ স্বরূপ তিনটি মেখলা পরিধান করেন। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞানের উপাসনা সম্বলিত ঋক, সাম ও যজুঃ বেদশাস্ত্রগুলির প্রতীকস্বরূপ যজ্ঞ উপকরণাদি রূপে স্রুক্, স্রুব এবং অন্যান্য সামগ্রী তিনি ধারণ করে থাকেন।

তাৎপর্য

স্রুক্ বা হাতা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে ঘি ঢালবার উপযোগী এক প্রকার উপকরণ। *বিকঙ্কত* নামে এক ধরনের কাঠ থেকে তৈরি এই উপকরণটি এক হাত লম্বা হয়। স্রুক্ বা হাতার লম্বা শিকের মতো হাতল থাকে এবং তার অগ্রভাগে হাঁসের ঠোঁটের মতো চ্যাপটা স্বল্প পরিমাণ গর্ত থাকে। এটির অগ্রভাগে হাতের মুঠোর মতো আকৃতিবিশিষ্ট একটি খোদাই করা চামচ থাকে। যজ্ঞে আহুতি প্রদানের জন্য ব্যবহৃত অন্য একটি উপকরণ স্রুব। এটি খদির কাষ্ঠ থেকে প্রস্তুত করা হয়, স্রুক্ উপকরণটি থেকেও ক্ষুদ্রাকার এবং স্রুক্ উপকরণের মধ্যে ঘি ঢালবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে অনেক সময়ে যজ্ঞাগ্নিতে সরাসরি আহুতির ঘি প্রদানের জন্য স্রুক্ ব্যবহার করা হয়। ত্রেতাযুগের যুগধর্ম যজ্ঞপালন প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন এইগুলি তাঁর প্রতীক হয়ে থাকে।

শ্লোক ২৫

তং তদা মনুজা দেবং সর্বদেবময়ং হরিম্ ।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৫ ॥

তম্—তাঁকে; **তদা**—তখন; **মনুজাঃ**—মনুষ্যজাতি; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্বদেবময়ম্**—যিনি তাঁর মধ্যে সকল দেবতাকে ধারণ করে থাকেন; **হরিম্**—শ্রীহরি; **যজন্তি**—তারা পূজা করে; **বিদ্যয়া**—শাস্ত্রসম্মতভাবে; **ত্রয্যা**—তিনটি মূল বেদশাস্ত্রের; **ধর্মিষ্ঠাঃ**—ধর্মানুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান; **ব্রহ্মবাদিনঃ**—পরমতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসুগণ।

অনুবাদ

ত্রেতাযুগে যে সকল মানুষ ধর্মাচরণে অভ্যস্ত হয় এবং আন্তরিকভাবে পরমতত্ত্বজ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হয়, তারা যে ভগবান শ্রীহরির মাঝে সকল দেবতা অবস্থিত থাকেন, তাঁকেই পূজা করে। তিনটি বেদশাস্ত্রের মাধ্যমে নির্দেশিত যজ্ঞক্রিয়াদি অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সত্যযুগে পৃথিবীবাসীদের সকল প্রকার শুভ গুণাবলী থাকে বলেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ত্রেতাযুগে মানব সমাজকে *ধর্মিষ্ঠা* অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধর্মপ্রাণ এবং *ব্রহ্মবাদিনঃ* অর্থাৎ বৈদিক যাগযজ্ঞাদির মাধ্যমে পরমতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে উদ্যোগী হয়। যাইহোক, এই শ্লোকে সত্যযুগের মানুষদের সর্বপ্রকার মহান গুণাবলী উল্লেখ করা হয়নি। পক্ষান্তরে, সত্যযুগে মানুষ আপনা হতেই শুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়ে থাকে, অথচ ত্রেতাযুগের মানুষেরা বৈদিক যজ্ঞাদি পালনের মাধ্যমে শুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়ে উঠতে

চায়। ত্রেতাযুগে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠে না, যেমন সত্যযুগে হয়ে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে থাকে, এবং তাই তারা নিষ্ঠাভরে বৈদিক অনুশাসনাদি অনুসরণ করে চলে।

শ্লোক ২৬

বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্বদেব উরুক্রমঃ ।
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্যতে ॥ ২৬ ॥

বিষ্ণুঃ—সর্বময় পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞের অধিপতি; **পৃশ্নিগর্ভঃ**—পৃশ্নি ও প্রজাপতি সুতপার পুত্র; **সর্বদেবঃ**—সকল দেবতার প্রভু; **উরুক্রমঃ**—আশ্চর্য ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠাতা; **বৃষাকপিঃ**—শুধুমাত্র স্মরণ করলেই যে ভগবান সকল দুঃখ-কষ্ট লাঘব করে সর্বপ্রকার বাসনা পরিপূরণ করে থাকেন; **জয়ন্তঃ**—সর্ববিষয়ে বিজয়ী; **চ**—এবং; **উরুগায়ঃ**—সর্ববিষয়ে মহিমান্বিত; **ইতি**—এই সকল নামে; **ঈর্যতে**—তাঁকে বলা হয়।

অনুবাদ

ত্রেতাযুগে শ্রীভগবানকে বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায় নামে বন্দিত হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পৃশ্নিগর্ভ শব্দটি দ্বারা পৃশ্নিদেবী ও প্রজাপতি সুতপার পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতারকে বোঝানো হয়েছে। *বৃষাকপি* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, জীব যদি কেবলমাত্র ভগবানকে স্মরণ করে তাহলেই তিনি তাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা দূর করে তাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করার মাধ্যমে তাদের সকল আকাঙ্ক্ষার সন্তুষ্টি বিধান করেন। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সর্বদা বিজয়ী তাই তাঁকে জয়ন্ত বলা হয়।

শ্লোক ২৭

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥

দ্বাপরে—দ্বাপর যুগে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শ্যামঃ**—ঘন নীল; **পীতবাসাঃ**—পীতবর্ণের বসনধারী; **নিজ-আয়ুধঃ**—তাঁর নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্রাদি (শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম) ধারণ করে; **শ্রীবৎস-আদিভিঃ**—শ্রীবৎস এবং অন্যান্যদের দ্বারা; **অঙ্কৈঃ**—দেহ চিহ্নাদি সহ; **চ**—এবং; **লক্ষণৈঃ**—অলঙ্কারাদি সহ; **উপলক্ষিতঃ**—বিশেষভাবে চিহ্নিত।

অনুবাদ

দ্বাপর যুগে পরমেশ্বর ভগবান পীত বস্ত্র পরিধান করে শ্যাম বর্ণে অবতরণ করেন। এই অবতরণে ভগবানের দেহ শ্রীবৎস ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যমূলক অলঙ্কার দ্বারা চিহ্নিত থাকে এবং তিনি তাঁর নিজস্ব অস্ত্রসমূহের প্রকাশ ঘটান।

তাৎপর্য

দ্বাপর যুগে ভগবানের চিন্ময় দেহকে শ্যামবর্ণ ফুলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ভগবান সুদর্শন চক্রের মতো তাঁর নিজস্ব চিন্ময় অস্ত্রসমূহ এবং তাঁর দেহের সকল অঙ্গসমূহ, বিশেষত পতাকা ও পদ্মফুলের পবিত্র চিহ্ন দ্বারা অলঙ্কৃত তাঁর হস্ত পদদ্বয় প্রদর্শন করলেন। তারপর তাঁর বক্ষোপরে কৌস্তুভমণি সহ ডান বক্ষে বাম থেকে ডান দিকে চক্রাকারে স্থিত কুঞ্চিত কেশরাশিরূপ পবিত্র শ্রীবৎস চিহ্নের প্রকাশ ঘটালেন। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কৌস্তুভমণি ও শ্রীবৎস চিহ্ন এবং ভগবানের অস্ত্রসমূহ সকল বিষ্ণুতত্ত্ব অবতারের মধ্যেই উপস্থিত থাকে। শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে করভাজন মুনি দ্বারা উল্লেখিত ভগবানের এই সকল সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলি কৃষ্ণ অবতারকেই নির্দেশ করছে। কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন সকল অবতারের অবতারী আর অন্যান্য অবতারের লক্ষণসমূহও তাঁর চিন্ময় দেহে পাওয়া যায়

শ্লোক ২৮

তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্ ।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥ ২৮ ॥

তম্—তাঁকে; **তদা**—সেই যুগে; **পুরুষম্**—পরম ভোক্তা; **মর্ত্যাঃ**—মর্তের মানুষেরা; **মহা-রাজঃ**—এক মহান নৃপতি; **উপলক্ষণম্**—ভূমিকায়; **যজন্তি**—তারা পূজা করেন; **বেদ-তন্ত্রাভ্যাম্**—বৈদিক শাস্ত্রাদি এবং তন্ত্রযন্ত্রাদি উভয় বিধান অনুসারে; **পরম্**—পরম; **জিজ্ঞাসবঃ**—যারা জ্ঞান লাভ করতে চান; **নৃপ**—হে রাজন।

অনুবাদ

হে রাজন্, পরম ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানকে দ্বাপর যুগের যে সকল মানুষ অবগত হতে অভিলাষী হতেন, তাঁরা বৈদিক শাস্ত্রাদি এবং তন্ত্রমন্ত্রাদি উভয়ের বিধানাদি অনুসরণে পরম ভোক্তার মর্যাদায় ভগবানকে মহারাজের সম্মান জানিয়ে পূজা করে থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করছিলেন, অর্জুন তখন নিজে শ্রীভগবানের উপরে ছত্র ধারণ করেন, এবং উদ্ধব ও সাত্যকি বর্ণাঢ্য চামরের দ্বারা

শ্রীভগবানকে বাতাস দিতে থাকেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১০/১৭-১৮)। এইভাবেই, সম্রাট যুধিষ্ঠির এবং তাঁর অনুগামীরা শ্রীকৃষ্ণকে সকল মহান রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং পরমেশ্বর ভগবান রূপে বন্দনা জানিয়েছিলেন। তেমনই, রাজসূয় যজ্ঞে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহাত্মামণ্ডলীর সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে সকল রাজন্যবর্গেরও রাজা, তথা বিরাট ব্যক্তিত্বরূপে মনোনীত করেছিলেন, যিনি ছিলেন সকলের মাঝে সর্বপ্রথম পূজনীয় পুরুষ। এই ধরনের বিপুল শ্রদ্ধাপূর্ণ ভগবৎ আরাধনা দ্বাপর যুগেরই বৈশিষ্ট, যা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে (*মহারাজোপলক্ষণম্*)। প্রত্যেকটি যুগপরম্পরাক্রমে, যথা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগে মানব সমাজের অবস্থা ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হতেই থাকে। এই শ্লোকটিতে তাই বলা হয়েছে, দ্বাপর যুগের অধিবাসীদের একমাত্র অনুকূল যোগ্যতা এই হয় যে, তারা *জিজ্ঞাসবঃ* অর্থাৎ পরমতত্ত্ব বিষয়ে বিপুলভাবে অনুসন্ধিৎসু হয়ে থাকে। তাছাড়া আর কোনও সদ্‌গুণ উল্লেখ করা হয়নি। সত্যযুগের অধিবাসীরা *শান্তাঃ, নির্বৈরাঃ, সুহৃদঃ* এবং *সমাঃ* অর্থাৎ শান্ত, বিদ্বেষহীন, সর্বজীবের হিতকারী, এবং পারমার্থিক স্তরে সুস্থিরচিত্তে অবস্থানের মাধ্যমে জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন। তেমনই, ত্রেতাযুগের অধিবাসীরা *ধর্মিষ্ঠাঃ* এবং *ব্রহ্মবাদিনঃ* অর্থাৎ বিশেষভাবে ধর্মভাবাপন্ন এবং বৈদিক অনুশাসনাদিতে বিশেষ নিষ্ঠাবান হয়ে থাকেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান শ্লোকটিতে, দ্বাপর যুগের অধিবাসীদের নিতান্তই *জিজ্ঞাসবঃ* অর্থাৎ পরম তত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যথায় তাদের *মর্ত্যাঃ* অর্থাৎ মর্ত্যবাসীদের দুর্বলতাসম্পন্ন বলা হয়েছে। যদি দ্বাপর যুগেরও মানব সমাজ স্পষ্টতই সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগের মানুষের চেয়েও হীনতাসম্পন্ন হয়ে থাকে, তা হলে কলিযুগের মানব সমাজের যথার্থ দুর্দশার কথা আমাদের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন কাজ। অতএব, পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হবে, কিভাবে বর্তমান কলিযুগে জন্মগ্রহণকারী মানুষেরা তাদের নির্বুদ্ধিতার জীবন থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করার মাধ্যমে জীবন সার্থক করে তুলতে পারে।

শ্লোক ২৯-৩০

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ২৯ ॥
নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে ।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ ৩০ ॥

নমঃ—প্রণাম; **তে**—আপনাকে; **বাসুদেবায়**—বাসুদেব; **নমঃ**—প্রণাম; **সঙ্কর্ষণায়**—শ্রীসঙ্কর্ষণের; **চ**—এবং; **প্রদ্যুম্নায়**—শ্রীপ্রদ্যুম্নের উদ্দেশ্যে; **অনিরুদ্ধায়**—শ্রীঅনিরুদ্ধের উদ্দেশ্যে; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **নমঃ**—প্রণতি জানাই; **নারায়ণায় ঋষয়ে**—ভগবান শ্রীনারায়ণ ঋষিকে; **পুরুষায়**—পরমভোক্তা পুরুষ ও জড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা; **মহা-আত্মনে**—পরমাত্মা; **বিশ্ব-ঈশ্বরায়**—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর; **বিশ্বায়**—এবং স্বয়ং বিশ্বরূপ; **সর্বভূত-আত্মনে**—সকল জীবের পরমাত্মা; **নমঃ**—প্রণাম করি।

অনুবাদ

"হে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেব, আপনাকে প্রণতি জানাই, এবং আপনার অভিপ্রকাশ-রূপ শ্রীসংকর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন এবং শ্রীঅনিরুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। হে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, আপনার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকারে প্রণতি জানাই। হে শ্রীনারায়ণ ঋষি, হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পরম পুরুষোত্তম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, এবং যথার্থ বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, হে সর্বভূতাত্মা, আপনাকে সর্বপ্রকারে নমস্কার জানাই।"

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগের শেষাংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা হলেও মহামুনিগণ এই শ্লোকটি সেই যুগের প্রারম্ভ থেকেই তাঁর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় উচ্চারণ করতে থাকেন।

সাধারণ বদ্ধ জীব শ্রীভগবানের নিত্যদাস হলেও, জড়া প্রকৃতির সৃষ্টিরাজ্যে আধিপত্যের চেষ্টায় মগ্ন থাকে, তা সত্ত্বেও পরিণামে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনেই তাদের থাকতে হয়। শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকাই জীবের স্বরূপ। তা ছাড়াও জড়া প্রকৃতিরও স্বরূপমর্যাদা এমনই যে, শ্রীভগবানের দিব্য অভিলাষের প্রীতিবিধানের জন্যই তাকে নিয়োজিত করতে হয়। তাই এই শ্লোকে উল্লিখিত এই সকল প্রার্থনাবলী পঞ্চরাত্র এবং বৈদিক মন্ত্রাবলী অনুযায়ী পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে, যাতে মানুষ পরমতত্ত্বের প্রতি তার নিত্য দাসত্বের মর্যাদা স্মরণের মাধ্যমে স্থিতধী হতে পারে।

পরম জীব শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে *চতুর্ব্যূহ* অর্থাৎ চতুর্মুখী স্বপ্রকাশ রূপে অভিব্যক্ত করে থাকেন। এই প্রার্থনাটির উদ্দেশ্য এই যে, মিথ্যা অহম্‌বোধ বর্জন করে মানুষকে এই চতুর্ব্যূহের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে প্রণতি জানাতে হবে। যদিও পরমতত্ত্ব এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা, তবু সেই পরম তত্ত্ব তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য ও শক্তিরাজি প্রদর্শন করেন এবং অগণিত অংশপ্রকাশের মাধ্যমে আপনাকে বিস্তারিত

করে রাখেন, যেগুলির মধ্যে চতুর্ব্যূহ একটি প্রধান অংশপ্রকাশ। মূল তত্ত্ব শ্রীবাসুদেব, পরমেশ্বর শ্রীভগবান। যখন ঈশ্বর তাঁর আদি শক্তিরাশি ও ঐশ্বর্যসমূহ প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় সংকর্ষণ। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি আত্মাস্বরূপ, সেই বিষ্ণু অংশপ্রকাশের মূল ভিত্তি প্রদ্যুম্ন, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটি জীবসত্তার পরমাত্মা রূপে শ্রীবিষ্ণুর স্বপ্রকাশের ভিত্তি হলেন শ্রীঅনিরুদ্ধ। এখানে উল্লিখিত চারটি স্বপ্রকাশের মধ্যে, মূল আদি অংশপ্রকাশ শ্রীবাসুদেব, এবং অন্য তিনটিকে তাঁরই বিশেষ প্রকাশ রূপে বিবেচনা করা হয়।

যখন জীব বিস্মৃত হয় যে, সে নিজে এবং জড়া প্রকৃতিও সবই শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে, তখন তার অজ্ঞানতার রূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং বদ্ধজীব নিজেই প্রভু হয়ে উঠার বাসনা পোষণ করে। এইভাবেই বদ্ধজীব কল্পনা করে যে, সমাজে সে একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কিংবা মনে করে, সে একজন বিরাট দার্শনিক। বৈদিক মন্ত্রাবলী এবং পঞ্চতন্ত্র শাস্ত্রাদি মানব জাতিকে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পরামর্শ দিয়ে থাকে, যার মাধ্যমে নিজেকে সমাজের এক সম্মানীয় মানুষ কিংবা মস্তবড় দার্শনিক বলে মনে করবার কলুষভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। যথার্থ জ্ঞানের মাঝে অধিষ্ঠিত হলে মানুষ নিজেকে পরমতত্ত্বেরই এক অতি সামান্য দাস রূপে উপলব্ধি করতে পারে।

দ্বাপর যুগে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনাই প্রধান কর্তব্য কর্ম। *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* পদ্ধতির মাধ্যমেই এই ধরনের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার চরম লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। শ্রীভগবানের মহিমারাজি শ্রবণ ও কীর্তনের অভ্যাস ব্যতিরেকে মানুষ শ্রীবিগ্রহ আরাধনা সম্পন্ন করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণাবলী, পরিকরাদি, পরিক্রমা এবং লীলাবিস্তারের মহিমা বর্ণনার মাধ্যমে পূজারী শ্রীবিগ্রহ আরাধনার অনুশীলন করবেন, সেটাই বাঞ্ছনীয়। যখন এইভাবে মহিমা কীর্তন সুসম্পন্ন হয়, তখনই মাত্র পূজারী শ্রীভগবানের মহিমা শ্রবণের মাধ্যমে পারমার্থিক জ্ঞান উপলব্ধির যোগ্য হয়ে উঠেন।

শ্লোক ৩১

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ৩১ ॥

ইতি—এইভাবে; **দ্বাপরে**—দ্বাপর যুগে; **উরু-ঈশ**—হে রাজন; **স্তুবন্তি**—তারা গুণগান করে; **জগৎ-ঈশ্বরম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু; **নানা**—বিবিধ; **তন্ত্র**—শাস্ত্রাদির; **বিধানেন**—

বিধিনিয়ম অনুসারে; কলৌ—কলিযুগে; অপি—ও; তথা—যেভাবে; শৃণু—অনুগ্রহপূর্বক শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

হে রাজন, এইভাবে দ্বাপরযুগের মানুষেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির বন্দনা করতেন। কলিযুগেও মানুষ দিব্য শাস্ত্রাদির বিবিধ বিধিনিয়মাদি অনুসরণের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে থাকেন। এখন কৃপা করে আমার কাছে এই বিষয়ে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে *কলাবপি*, "কলিযুগেও" শব্দসমষ্টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বজনবিদিত তথ্য এই যে, কলিযুগ একটি অধর্মাচারী যুগ। তাই এমনভাবে সম্পূর্ণ ধর্মবিহীন কোনও যুগে পরমেশ্বর ভগবান যে পূজিত হচ্ছেন, তা বিস্ময়কর ব্যাপার। তাই বলা হয়েছে *কলাবপি*, "এমনি কলিযুগেও"। পরমেশ্বর ভগবানের অবতার কলিযুগে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানরূপে পূজিত হন না, বরং দিব্য বৈদিক শাস্ত্রাদি অনুসারে সুচতুর ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা তিনি আবিষ্কৃত হয়ে থাকেন। এইভাবেই, প্রহ্লাদ মহারাজ *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৯/৩৮) বলেছেন—

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈঃ
লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্ ।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্তম্ ॥

"এইভাবে, হে ভগবান, আপনি বিভিন্ন অবতারকালে মানুষ, পশু, মহর্ষি দেবতা, মীন কিংবা কূর্ম রূপে আবির্ভূত হন, যাতে বিভিন্ন গ্রহ ব্যবস্থার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির পালন হয় এবং আসুরিক নীতিগুলির দমন হয়। যুগ অনুসারে, হে ভগবান, আপনি ধর্মনীতি রক্ষা করে থাকেন। অবশ্য কলিযুগে আপনি পরমেশ্বর ভগবান রূপে আপনাকে আত্মপরিচিত করেন না, তাই আপনাকে ত্রিযুগ অর্থাৎ তিনযুগে আবির্ভূত শ্রীভগবান বলা হয়ে থাকে।" অতএব এইভাবে বোঝা যায় যে, কলিযুগে শ্রীভগবানের অবতার সাধারণ মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন হয়, যেহেতু এই যুগে শ্রীভগবানের আবির্ভাব ঈষৎভাবে আচ্ছন্ন থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, *নানাতন্ত্র বিধানেন* শব্দটির দ্বারা কলিযুগে *পঞ্চরাত্র* কিংবা *সাত্বত-পঞ্চরাত্র* নামক বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলির উপযোগিতা বোঝানো হয়েছে। *ভাগবতে* বলা হয়েছে, *স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা*—কলিযুগে সাধারণ মানুষের পক্ষে অতি উচ্চ পর্যায়ের কুশলতানির্ভর বৈদিক যজ্ঞাদি

অনুষ্ঠান কিংবা গূঢ়রহস্যাবৃত যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে অসহনীয় কৃচ্ছ্রতা সাধন করা অসম্ভব। কলিযুগের মধ্যে অধ্যাত্মবাদে অপটু জনগণের পক্ষে বাস্তবিকই যথার্থ বৈদিক প্রক্রিয়াদি আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। তাই পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম যশ কীর্তনের সহজ প্রক্রিয়াই এই যুগে অত্যাবশ্যক। *পঞ্চরাত্র* প্রমুখ সুবিদিত বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রসমূহের মধ্যে বিশদভাবে শ্রীভগবানের পবিত্র নামাবলী এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ আরাধনার ভক্তিমূলক পদ্ধতি-প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকটিতে ঐ সকল তান্ত্রিক শাস্ত্রসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে, শ্রীনারদ মুনি প্রমুখ মহান্ আচার্যবর্গের দ্বারা উপদিষ্ট এই সকল ভক্তিমূলক পদ্ধতিগুলিই কলিযুগে ভগবৎ-আরাধনার একমাত্র বাস্তবসম্মত উপায়। পরবর্তী শ্লোকে এই বিষয়ে আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

শ্লোক ৩২

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণ-বর্ণম্—কৃষ্-ণ শব্দাংশগুলি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে; **ত্বিষা**—ঔজ্জ্বল্য সমন্বিত; **অকৃষ্ণম্**—কৃষ্ণবর্ণ নয় (গৌরবর্ণ); **স-অঙ্গঃ**—সঙ্গীসাথী সহ; **উপ-অঙ্গ**—সেবকগণ; **অস্ত্র**—অস্ত্রশস্ত্র; **পার্ষদম্**—একান্ত সহচরবৃন্দ; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের মাধ্যমে; **সঙ্কীর্তন-প্রায়ৈঃ**—মূলত সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংকীর্তনের দ্বারা; **যজন্তি**—তাঁরা ভজনা করে; **হি**—অবশ্যই; **সু-মেধসঃ**—বুদ্ধিমান মানুষেরা।

অনুবাদ

কলিযুগে যেসব বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবৎ-আরাধনার উদ্দেশ্যে সঙ্কীর্তন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁরা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণের নামগানের মাধ্যমে ভগবৎ-অবতারের আরাধনা করে থাকেন। যদিও তাঁর দেহ কৃষ্ণবর্ণ নয়, তা হলেও তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গে পার্ষদরূপে রয়েছেন তার অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা, সেবকগণ, অস্ত্র এবং সহযোগীবৃন্দ।

তাৎপর্য

এই একই শ্লোক *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের আদিলীলা খণ্ড, ৩য় অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছে। এই শ্লোকটির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। "এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/৩২) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী *ভাগবতের* ভাষ্য প্রদান প্রসঙ্গে '*কর্মসন্দর্ভ*' নামে অভিহিত রচনার মাধ্যমে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায়

বলেছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ ধারণ করেও আবির্ভূত হন। সেই গৌরবর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি এই যুগের বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে পূজিত হয়ে থাকেন। গর্গ মুনিও *শ্রীমদ্ভাগবতে* তা প্রতিপন্ন করেছে, যিনি বলেছেন যে, শিশু কৃষ্ণ যদিও কৃষ্ণবর্ণের, তা হলেও তিনি অন্য তিনটি বর্ণেও আবির্ভূত হন—যেমন, রক্ত বর্ণ, শ্বেতবর্ণ এবং গৌরবর্ণ। শ্রীভগবান তাঁর শ্বেত এবং রক্ত বর্ণের রূপ প্রকাশ করেন যথাক্রমে সত্য ও ত্রেতা যুগে। গৌরহরি নামে শ্রদ্ধান্বিত শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীভগবান গৌরবর্ণ প্রকাশের ইচ্ছা করেননি।

"শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, কৃষ্ণবর্ণ মানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য: *কৃষ্ণবর্ণম্* এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমমর্যাদাসম্পন্ন অভিধা। শ্রীকৃষ্ণ নামটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু উভয়ের সাথেই আবির্ভূত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, তবে তিনি সদাসর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় নিয়োজিত থাকেন এবং সেইভাবেই তাঁর নাম ও রূপের কীর্তন ও মননের দিব্য আনন্দ আস্বাদন করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎ-বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। *বর্ণয়তি* মানে 'উচ্চারণ করেন' অথবা 'বর্ণনা করেন'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিয়তই শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য পবিত্র নামকীর্তন করেন এবং তাঁর বর্ণনাও করেন, এবং যেহেতু তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাই তাঁর দর্শন যিনিই লাভ করেন, তিনিও স্বপ্রবৃত্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপকীর্তন করতে থাকেন এবং পরে সকলের কাছে তা বর্ণনাও করেন। তিনি মানুষকে দিব্য কৃষ্ণভাবনামৃতে সঞ্জীবিত করেন, যার ফলে কীর্তনকারী দিব্য আনন্দে মগ্ন হন। সর্ব বিষয়ে তাই তিনি প্রত্যেকের সামনেই রূপ শব্দের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শনমাত্রই মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে থাকে। অতএব তাঁকে বিষ্ণুতত্ত্ব রূপে মর্যাদা দিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

"*সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্* শব্দটি আরও বোঝায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর শরীর সদা সর্বদাই চন্দনকাষ্ঠের অলঙ্কারাদি দ্বারা শোভিত হয়ে থাকে এবং চন্দনচর্চিত হয়। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর যুগের সকল মানুষকেই অভিভূত করেন। অন্যান্য আবির্ভাবকালে শ্রীভগবান কখনও আসুরিক জীবকে পরাভূত করার জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রয়োগ করেন, কিন্তু এই যুগে শ্রীভগবান সেইগুলি তাঁর সর্বাকর্ষক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবদমিত করেন। শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, অসুরাদি দমনের উদ্দেশ্যেই তাঁর রূপসৌন্দর্য হয়েছে তাঁর অস্ত্র। যেহেতু তিনি পরম মনোহর চিত্রহারী রূপময়,

তাই বোঝা যায় যে, তাঁর পার্ষদ হয়ে সমস্ত দেবতাগণও তাঁর সাথে বিদ্যমান হয়েছিলেন। তাঁর ক্রিয়াকর্মগুলি ছিল অসামান্য এবং তাঁর পার্ষদবর্গও অত্যাশ্চর্য। যখন তিনি সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন, তখন তিনি বহু বিশিষ্ট বিদ্বান পণ্ডিত ও আচার্যবর্গকে বিশেষত বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা থেকে আকৃষ্ট করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের মতো একান্ত পার্ষদবর্গের সঙ্গলাভ করতেন।

"শ্রীল জীব গোস্বামী বৈদিক শাস্ত্র থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, যজ্ঞানুষ্ঠান কিংবা উৎসবানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন নেই। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এই ধরনের বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শন না করে সমস্ত মানুষ জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে হরেকৃষ্ণ নামজপকীর্তনের মাধ্যমে সমবেতভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে পারেন। *কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্* শব্দসমষ্টি থেকে বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণনামেই প্রাধান্য দিতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং কৃষ্ণনাম কীর্তন করতেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে হলে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' মহামন্ত্র প্রত্যেককেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে জপকীর্তন করতে হবে। গির্জায়, মন্দিরে কিংবা মসজিদে গিয়ে সকলের পক্ষে ভগবৎ-আরাধনার কথা প্রচার করা আর সম্ভব নয়, কারণ মানুষ তাতে সব আগ্রহ হারিয়েছে। কিন্তু মানুষ সর্বত্রই সকল সময়ে হরেকৃষ্ণ নাম জপ কীর্তন করতে পারে। এইভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনার মাধ্যমে, তারা সর্বোচ্চ কর্তব্য সাধন করতে পারবে এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের জন্য সর্বোত্তম ধর্মকর্মের উদ্দেশ্য সাধন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে।

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রখ্যাত শিষ্য শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'দিব্য ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের নীতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবদ্ভক্তির পদ্ধতি আবার বিতরণের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এমনই কৃপাময় যে, তিনি কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করছেন। যেভাবে পদ্মফুলের দিকে মৌমাছিরা গুণ্‌গুণ্ করে আকৃষ্ট হয়ে থাকে, সেইভাবেই প্রত্যেক মানুষ তাঁর পাদপদ্মের দিকে কৃষ্ণনামের আকর্ষণে এগিয়ে যাবে।"

মহাভারতের দানধর্ম পর্বের ১৮৯ অধ্যায়ের মধ্যে উল্লিখিত *শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম* অংশেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী এই প্রসঙ্গটি নিম্নরূপে উদ্ধৃত করেছেন—*সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী*।—"তাঁর পূর্বলীলায় তিনি গৌরবর্ণ গৃহস্থ রূপে আবির্ভূত হন।

তাঁর সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং তাঁর চন্দনচর্চিত দেহ গলিত স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল মনে হত।" তিনি আরও উদ্ধৃত করেছেন যে, *সন্ন্যাসকৃচ্ছ্রমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ*—"তাঁর পরবর্তী লীলায় তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, এবং তিনি শান্ত ও নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠেন। নিরাকার নির্বিশেষবাদী অভক্তদের স্তব্ধ করে দিয়ে তিনি পরম শান্তি এবং ভক্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন।"

শ্লোক ৩৩

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৩ ॥

ধ্যেয়ম্—ধ্যানের উপযোগী; **সদা**—সর্বদা; **পরিভব**—জাগতিক অস্তিত্বের অবমাননা; **ঘ্নম্**—ধ্বংস করে; **অভীষ্ট**—আত্মার যথার্থ অভিলাষ; **দোহম্**—যা থেকে যথার্থ ফললাভ হয়; **তীর্থ**—সকল তীর্থস্থান ও মহাপুরুষদের; **আস্পদম্**—স্থান; **শিববিরিঞ্চি**—দেবাদিদেব শিব এবং ব্রহ্মার দ্বারা; **নুতম্**—প্রণত; **শরণ্যম্**—আশ্রয় গ্রহণের বিশেষ উপযোগী; **ভৃত্য**—আপনার সেবকগণ; **আর্তিহম্**—দুঃখ হরণ করে; **প্রণতপাল**—আপনার শ্রীচরণে প্রণত সকলের ত্রাতা; **ভব-অব্ধি**—জন্ম-মৃত্যুর সমুদ্রে; **পোতম্**—অতিক্রমের উপযোগী তরণী; **বন্দে**—আমি বন্দনা করি; **মহাপুরুষ**—হে মহাপ্রভু; **তে**—আপনার প্রতি; **চরণ-অরবিন্দম্**—চরণপদ্ম।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি মহাপুরুষ, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, এবং ধ্যানমগ্ন হওয়ার একমাত্র নিত্য বিষয়রূপে আপনার শ্রীচরণপদ্ম আমি বন্দনা করি। এই চরণ দুখানি জড়জাগতিক জীবনের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটায় এবং জীবাত্মার সর্বোচ্চ বাসনা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অভিলাষ পূরণ করে। প্রিয় প্রভু, আপনার শ্রীচরণকমল সকল তীর্থ এবং ভগবদ্ভক্তির সকল তীর্থকেন্দ্র ও সকল মহাপুরুষবর্গের ভক্তিসেবার আশ্রয় প্রদান করে এবং দেবাদিদেব শিব ও ব্রহ্মার মতো শক্তিমান দেবতাদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে। হে প্রভু, আপনি এমনই কৃপাময় যে, যে সকল মানুষ শ্রদ্ধাভরে আপনার কাছে প্রণত হয়, তাদের সকলকেই আপনি সানন্দে সুরক্ষিত রাখেন, এবং আপনার সেবকদের সকল দুঃখদুর্দশা আপনি প্রশমন করে থাকেন। পরিশেষে, হে প্রভু, জন্মমৃত্যুর ভবসাগর পাড়ি দিতে হলে আপনার শ্রীচরণকমলই যথার্থ তরণীস্বরূপ, তাই দেবাদিদেব শিব এবং ব্রহ্মাও আপনার শ্রীচরণ কমলের আশ্রয় অভিলাষ করে থাকেন।

তাৎপর্য

কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবানের অবতারের কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বে সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে শ্রীভগবানের অবতারের কথা বর্ণনার পরে শ্রীকরভাজন ঋষি প্রত্যেক যুগের উপযোগী ভগবৎ-মহিমা কীর্তনের জন্য প্রার্থনা উপস্থাপন করেছেন। *কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্* শ্লোকটির মাধ্যমে কলিযুগে শ্রীভগবানের অবতারের বিষয়ে বর্ণনা করার পরে, বর্তমান ও পরবর্তী শ্লোকগুলি এখন পরিবেশিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে *কৃষ্ণবর্ণম্* শরীরে কলিযুগে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের গুণগান করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে আবির্ভূত হন এবং পবিত্র কৃষ্ণনামে প্রত্যেক মানুষকে দীক্ষিত করেন। ইসকন আন্দোলনের সদস্যবৃন্দ কৃষ্ণনামে এমনই মগ্ন থাকেন কিংবা *কৃষ্ণবর্ণম্* ভাবধারায় এমনভাবে আপ্লুত থাকেন যে, তাদের কৃষ্ণভক্ত বলা হয়ে থাকে। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের সংস্পর্শে যাঁরাই আসেন, তাঁরা অচিরেই শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপকীর্তনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণভজনা করতে শুরু করে থাকেন।

ধ্যেয়ং সদা অর্থাৎ 'সদাসর্বদা ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকা' কথাগুলির দ্বারা বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম জপকীর্তনের জন্য এই যুগে কোনও বিশেষ রীতিনীতি নির্ধারিত হয়নি। কলিযুগে শ্রীভগবানের চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হওয়ার প্রামাণ্য প্রথা হল—বিশেষভাবে অনুমোদিত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্রটি নিরন্তর জপ অনুশীলন করা। এই প্রথাটি নিত্য এবং সদাসর্বদা অভ্যাস করতে হবে। এইভাবেই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ*—কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবান কৃপা করে তাঁর সকল শক্তিসম্পদ তাঁর পবিত্র নামের মধ্যে অর্পণ করেছেন, এবং এই নামাবলী জপ অনুশীলনের কোনও সুনির্দিষ্ট বিধিনিয়ম নেই। সচরাচর কোনও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান পালন করতে হলে কিংবা বিশেষ কোনও বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণ করবার জন্য তার সময়, ঋতু, স্থান, পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে যেসব কঠোর বিধিনিয়ম অনুসরণ করতে হয়, তেমন কোনই কঠোরতা অবলম্বন করতে হয় না। তবে, পবিত্র কৃষ্ণনাম সর্বত্র সকল সময়ে, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই জপ ও স্মরণ করা উচিত। এবিষয়ে স্থান ও কালের কোনও বিধিনিষেধ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীর এই তাৎপর্য।

পরিভবঘ্নং শব্দটি এই শ্লোকে তাৎপর্যপূর্ণ। কলিযুগে মানবসমাজ ঈর্ষাবিদ্বেষে কলুষিত। একই পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন মানুষেরা প্রচণ্ড ঈর্ষাজর্জরিত হয়ে থাকে, যারা এই যুগে সর্বদা সর্বত্র কলহে লিপ্ত হয়। তেমনই, প্রতিবেশীরাও পরস্পরের

প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে থাকে এবং পরস্পরের ধনসম্পদ ও মানমর্যাদায় ঈর্ষাবোধ করতে থাকে। আর সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন জাতিগুলিও ঈর্ষাজর্জরিত হয়ে অযথা যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হয়ে ভয়ানক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রাদি নিয়ে গণহত্যার দায়দায়িত্বের শিকার হয়। তবে পরিবারবর্গ, নবাগত মানুষ, বন্ধুরূপে পরিচিত অবিশ্বস্ত মানুষ, বিরুদ্ধবাদী জাতিবর্গ, অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সামাজিক অবমাননা, কর্কট ব্যাধি ইত্যাদি এই সর্বপ্রকার সঙ্কট থেকেই মুক্তিলাভের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা চলে। জড় দেহটিকে রক্ষা করা সম্ভব নয়, তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে যে মানুষ, তার সূক্ষ্ম জড়বাদী মন অথবা বহিরাবরণস্বরূপ দেহের সাথে আত্ম পরিচয়ের মায়ামোহ যেভাবে তাকে মানসিক পর্যায়ে আবদ্ধ করে রাখে, হৃদয়ের সেই কঠিন বন্ধনদশার গ্রন্থিমুক্ত সে হতে পারে। একবার এই মিথ্যা দেহাত্মপরিচয় বিনষ্ট হলেই, মানুষ যে কোনও বিরুদ্ধ জড়া প্রকৃতির পরিস্থিতির মধ্যেও আনন্দ অনুভব করতে পারে। যারা অনিত্য অস্থায়ী শরীরটিকে নিত্য স্থায়ী করে রাখার জন্য মূর্খের মতো প্রয়াসী হয় এবং মানবজীবনের যথার্থ প্রক্রিয়াটিকে চিরস্থায়ী করে রাখার ব্রতসাধনে অবহেলা করে থাকে, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমলে আশ্রয়লাভের উদ্যোগে অবহেলা করে, তারা তাদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে থাকে।

এই শ্লোকটিতে *তীর্থাস্পদম্* শব্দটির অর্থ এই যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মই সকল তীর্থস্থানের আশ্রয়স্থল। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যতই সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হচ্ছে, ততই আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করছি, বিশেষত দরিদ্র জনগণের 'তৃতীয় বিশ্ব' রূপে পরিগণিত দেশগুলিতে, শ্রীবৃন্দাবনধাম এবং শ্রীধাম মায়াপুরের মতো অতিমহান পবিত্র তীর্থস্থানগুলিকে ভ্রমণ করবার উদ্দেশ্যে মানুষের পক্ষে আসা-যাওয়া খুব কষ্টকর। বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকায় বিপুলসংখ্যক ভক্তবৃন্দের পক্ষে ভারতবর্ষের ঐ সব জায়গাগুলিতে এসে তাদের জীবন শুদ্ধ করে তোলা খুবই দুঃসাধ্য। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই কৃপাময় যে, শুধুমাত্র তাঁকে আরাধনা করার মাধ্যমেই, সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম তথা পরম পবিত্র স্থানটি দর্শনের পুণ্য অর্জন করে থাকেন। এইভাবেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অনুগামীরা তাদের বাহ্যিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন—*কলৌ দ্রব্যদেশক্রিয়াদিজনিতং দুর্বারম্ অপাবিত্র্যম্ অপি নাশঙ্কনীয়ম্ ইতি ভাবঃ*। এই যুগে পাপময় জীবনধারায় জগৎ এমনভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, কলিযুগের সমস্ত

লক্ষণাদি থেকে মুক্ত থাকা অতীব কঠিন। তা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচারমূলক কাজে যে মানুষ নিষ্ঠাভরে সেবা নিবেদন করে থাকে, তার পক্ষে কলিযুগের ক্ষণিক অপরিহার্য লক্ষণাদির ভয় করবার কারণ ঘটে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা অবৈধ মৈথুনাচার বর্জন, নেশা ভাং বর্জন, আমিষাহার বর্জন এবং জুয়া খেলা বর্জনের চারটি বিধিবদ্ধ অনুশাসন কঠোরভাবে পালন করে থাকেন। তাঁরা সদাসর্বদাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ অনুশীলনের প্রয়াস করে থাকেন এবং শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্যই, কলিযুগের সাময়িক লক্ষণাদি দুর্ঘটনাবশত ঘটে যেতেও পারে—যেমন ঈর্ষাবিদ্বেষ, ক্রোধ, অহঙ্কার, লোভ ইত্যাদি ভক্তদের জীবনে এসে যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে ভক্ত যদি বাস্তবিকই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে থাকে, তা হলে তাঁর কৃপায় ঐ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনাদি তথা অনর্থ শীঘ্রই দূর হয়ে যায়। সুতরাং, নিষ্ঠাবান ভগবৎ-অনুগামী মানুষের পক্ষে তার নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম পালনে কখনই নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়, বরং তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা তার সমস্ত সঙ্কট দূরীভূত হয়ে যাবেই।

এই শ্লোকটিতে আরও বলা হয়েছে যে, *শিববিরিঞ্চি নুতম্।* দেবাদিদেব শিব এবং জগৎপিতা ব্রহ্মা নিঃসন্দেহে এই ব্রহ্মাণ্ডের দুই পরম শক্তিমান পুরুষ। তা সত্ত্বেও তাঁরা নিষ্ঠাভরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মের ভজনা করে থাকেন। কেন? *শরণ্যম্।* এমন কি দেবাদিদেব শিব এবং জগৎ পিতা ব্রহ্মাও শ্রীভগবানের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ না করে পারেননি।

ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল শব্দসমষ্টি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, যদি কেউ শ্রীভগবানের চরণকমলে কোনও প্রকার কপটতা ছাড়াই দণ্ডবৎ প্রণত হয়, তা হলে সেই নিষ্ঠাবান মানুষকে শ্রীভগবান সকল প্রকারে নিরাপত্তা প্রদান করে থাকেন। এই শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়নি যে, মানুষকে পরম ভগবদ্ভক্ত হতে হবে। বরং, উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কেউ কেবলমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রণত হয়, তা হলেই সে সকল প্রকারে নিরাপত্তা ভোগ করবে, এবং এই সৌভাগ্য অন্য সকলেই যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামপ্রচারের ব্রতসাধনে সেবা নিয়োজিত হতে প্রয়াসী হয়, তেমন যে কোনও মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এমন কি কনিষ্ঠ ভক্তও শ্রীভগবানের কৃপায় সব রকম নিরাপত্তা পাবে।

ভবাব্ধিপোতম্ অর্থাৎ "ভবসাগর অতিক্রমের উপযোগী নৌকা" সম্পর্কিত শব্দসমষ্টি সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* শ্রীব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের নিম্নরূপ উক্তি আছে—*ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্।* "অজ্ঞানতার

অন্ধকারময় মহাসমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য মহাজনদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে হলে আপনার চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় এবং তা হলে গোষ্পদ অতিক্রম করার মতোই অনায়াসে জড়জাগতিক সঙ্কটের সাগর পার হওয়া যায়।" শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী মানুষ জীবন্মুক্ত অর্থাৎ মুক্তাত্মা হয়ে থাকেন। তার ফলে, ভক্ত তাঁর ভবিষ্যতের লক্ষ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হন না, কারণ তিনি দৃঢ়নিশ্চিত যে, শ্রীভগবান অনতিবিলম্বে তাঁকে জড়জাগতিক অস্তিত্বের সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন। *শ্রীউপদেশামৃত* রচনায় *নিশ্চয়াৎ* শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমেও এই ধরনের দৃঢ়নিশ্চয়তার কথা বলা আছে, যার অর্থ এই যে, ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস বোঝায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত এই যে, *শিব-বিরিঞ্চি-নুতম্* শব্দপ্রকাশ থেকেও বুঝতে হবে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেবাদিদেব শিবের অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু এবং জগৎ পিতা শ্রীব্রহ্মার অবতার শ্রীহরিদাস ঠাকুরও আরাধনা করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এই শ্লোকটিতে মহাপুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম তথা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান রূপে আবাহন করা হয়েছে। সেইভাবেই, *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৩/১২) মহাপ্রভু বিষয়ে আলোচনা রয়েছে, *মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ*—"পরম শ্রেষ্ঠ প্রভু পরমেশ্বর শ্রীভগবান, যিনি সমগ্র বিশ্ব চরাচরের তথা মহাব্রহ্মাণ্ডেরও প্রবর্তক।" তেমনই, এই শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীগৌরকৃষ্ণকে মহাপুরুষ শব্দটির দ্বারা আবাহন করা হয়েছে, এবং তাঁর পাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করাই এই শ্লোকটির সর্বাত্মক অভিলাষ। তেমন পাদপদ্মই ধ্যানমগ্ন হওয়ার পক্ষে যথার্থ নিত্য বস্তু যেহেতু সেই চরণকমলই জড়জাগতিক জীবনের বন্ধন ছিন্ন করে এবং ভক্তমণ্ডলীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করে থাকে। যদিও বদ্ধ জীবেরা মায়ার অধীনে জীবনে বহু অনিত্য লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে, তা হলেও যথার্থ সৎ, চিৎ, আনন্দ কিছুই অর্জনের সম্ভাবনা তাদের জীবনে নেই। সেই নিত্যকালের সচ্চিদানন্দময় জীবনই যথার্থ সম্পদ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন সাধারণ মানুষ মনে করে তাঁর শ্রীচরণকমলের প্রতি অবহেলা করা এবং তার পরিবর্তে শ্রীভগবানের মায়াশক্তির প্রদত্ত অনাবশ্যক অস্থায়ী আশ্রয় গ্রহণ করা মানুষের উচিত নয়।

যে সব যোগীরা শ্রীভগবানের চরণকমল ছাড়া অন্য সমস্ত বস্তুকে ধ্যানের লক্ষ্যরূপে মনোনীত করে থাকে, তারা নিতান্তই নিজেদেরই শাশ্বত জীবনধারার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যখনই ধ্যানযোগী, ধ্যান এবং ধ্যানের মাধ্যমরূপে যথার্থ সামগ্রী সবগুলিই শ্রীভগবানেরই নিত্য শাশ্বত সমপর্যায়ে অবস্থিত হয়, তখনই যথাযথ আশ্রয় লাভ হয়ে থাকে। সচরাচর বদ্ধ জীবেরা *ভোগে-ত্যাগে* নিয়োজিত

হয়েই থাকে। কখনও তারা উন্মাদের মতো জাগতিক মানসম্ভ্রম মর্যাদা এবং ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে ছোটে, এবং কখনও তারা প্রাণপণে এই সব জিনিসই বর্জনের চেষ্টা করে। অবশ্যই, এইভাবে একাদিক্রমে ইন্দ্রিয় উপভোগ আর ভোগ বর্জনের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তিলাভের জন্যই রয়েছে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম, যার মাঝেই জীবের পরম শান্তি ও সুখের আবাস বিদ্যমান।

এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ অতিরিক্ত টীকাগুলি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রদান করেছেন—

ধেয়ম্—গায়ত্রী মন্ত্রে *ধীমহি* শব্দটির মাধ্যমে নির্দেশিত বস্তু।

তীর্থাস্পদম্—শ্রীগৌড়ক্ষেত্র এবং ব্রজমণ্ডল প্রমুখ তীর্থস্থানগুলির যথার্থ আশ্রয়; অথবা একাগ্র শ্রবণের মাধ্যমে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম, গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের মহান্ ভক্তমণ্ডলীর পাদপদ্ম আশ্রয় স্বরূপ। শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণের মাধ্যমে গুরুপরম্পরা শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ (মধ্বাচার্য) থেকে শুরু হয় এবং শ্রীরূপানুগ মহাভাগবতমণ্ডলী, শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত মহান্ অনুগামীদের দ্বারা অনুসৃত হয়।

শিব-বিরিঞ্চিনুতম্—দেবাদিদেব শ্রীমহাদেব (শিব) এর অবতার শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য প্রভুর দ্বারা, এবং শ্রীবিরিঞ্চিদেবের অবতার শ্রীমন্ আচার্য হরিদাস প্রভুর দ্বারা যিনি আরাধিত হন।

ভৃত্যার্তি-হম্—শ্রীচৈতন্যলীলায় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্রাহ্মণ বাসুদেব নামে তাঁর নিজ ভৃত্যের কষ্ট যিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে লাঘব করেছিলেন।

ভবাব্ধিপোতম্—সংসার সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার উপায়; মুক্তি অথবা জাগতিক সুখভোগের জন্য লোভের আকারে জীবকে বিচলিত করার মতো জাগতিক অস্তিত্ব থেকে নিজেদের মুক্তিলাভে উদ্যোগী জীবদের আশ্রয়। *মুক্তিকাম* অর্থাৎ মুক্তিলাভের বাসনা থেকে যাঁকে রক্ষা করা হয়েছিল, সেই সার্বভৌম ভট্টাচার্য, এবং *ভুক্তিকাম* অর্থাৎ জাগতিক ঐশ্বর্যের বাসনা থেকে যাঁকে রক্ষা করা হয়েছিল, সেই প্রতাপরুদ্র মহারাজ সেই ধরনের মানুষ, যাঁরা শ্রীভগবানের পাদপদ্মের এই দিব্য তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।

মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৪ ॥

ত্যক্ত্বা—পরিত্যাগ করে; **সু-দুস্ত্যজ**—ত্যাগ করা অতি দুঃসাধ্য; **সুর-ইপ্সিত**—দেবতাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত; **রাজ্যলক্ষ্মীম্**—সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবী এবং তাঁর ঐশ্বর্য; **ধর্মিষ্ঠঃ**—ধর্মাচরণে একান্ত নিষ্ঠাবান পুরুষ; **আর্যবচসা**—কোনও ব্রাহ্মণের বাক্যে (যিনি তাঁকে গার্হস্থ্য জীবনের সকল সুখ ভোগে বঞ্চিত করে অভিশাপ দিয়েছিলেন); **যৎ**—তিনিই; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **অরণ্যম্**—অরণ্যে (সন্ন্যাস জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে); **মায়ামৃগম্**—যে বদ্ধ জীব নিত্যনিয়ত মায়াময় ভোগ-উপভোগে সন্ধানী); **দয়িতয়া**—একান্ত কৃপাবশে; **ঈপ্সিতম্**—তাঁর বাঞ্ছিত বস্তু; **অন্বধাবৎ**—পিছনে ধাবমান হয়ে; **বন্দে**—আমার বন্দনা জানাই; **মহাপুরুষ**—হে মহাপ্রভু; **তে**—আপনার প্রতি; **চরণ-অরবিন্দম্**—শ্রীচরণকমল।

অনুবাদ

হে মহাপুরুষ, আপনার শ্রীচরণারবিন্দ আমি বন্দনা করি। যে রাজ্যলক্ষ্মীর সঙ্গ এবং তাঁর সকল ঐশ্বর্য ত্যাগ করা অতীব কঠিন কাজ এবং দেবতাগণও যা অর্জন করতে আগ্রহী, আপনি সেই সকলই বর্জন করেছেন। ধর্মপথের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে আপনি তাই ব্রাহ্মণের অভিশাপ অনুযায়ী বনগমন করেছেন। একান্ত কৃপাবশে আপনি মায়ামৃগ সম অধঃপতিত বদ্ধ জীবগণের অনুধাবন করে চলেছেন, এবং সেই সঙ্গে আপনার ঈপ্সিত লক্ষ্য ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দরের অনুসন্ধানে নিয়োজিত রয়েছেন।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের অভিমত অনুসারে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রেরও বর্ণনা করা হয়েছে বলেই বোঝা যায়। প্রত্যেক যুগে বদ্ধ জীবগণের উদ্ধারকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অবতারগণ অর্থাৎ যুগাবতারদের মধ্যে শ্রীকরভাজন ঋষির সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতারের মহিমা বর্ণনা করেই *বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্* শব্দসমষ্টির দ্বারা প্রার্থনাবলী শেষ হয়েছে বলেই বোঝা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বছর যাবৎ নবদ্বীপে গৃহস্থরূপে বসবাস করেছিলেন এবং পণ্ডিতবর্গ ও জন সাধারণের মাঝেও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর সংকীর্তন প্রচার আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় সরকারী সমর্থনপুষ্ট হয়েই চলত, যদিও সেই সরকার মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত হত। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাগ্যলক্ষ্মীকে বিবাহের

আনন্দ লাভ করেছিলেন। জড় জগতের কোনও সাধারণ মহিলা, তিনি যতই সৌন্দর্যময়ী হোন, অপরূপা সুন্দরী ভাগ্যলক্ষ্মীর সাথে তাঁর তুলনা কোনওভাবেই করা চলে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকেই, শ্রীব্রহ্মাণ্ড, ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে থাকেন। সুতরাং এখানে বলা হয়েছে *সুরেন্দ্রিত*।

যাইহোক, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাই তিনি অবশ্যই *ধর্মিষ্ঠঃ*; অর্থাৎ অতীব ধর্মভাবাপন্ন। প্রকৃতপক্ষে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান রাখাল বালক, মহারাজা কিংবা ব্রাহ্মণ যেভাবেই আবির্ভূত হন, সর্বদাই তিনি *ধর্মিষ্ঠঃ*, কারণ শ্রীভগবান স্বয়ং সকল ধর্মসম্বন্ধীয় নীতিবিষয়ের মূল উৎস এবং মূর্ত প্রতীক স্বরূপ। অবশ্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ খুবই অল্প। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন বিরাট দার্শনিক ব্রাহ্মণ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং সেই কারণেই তিনি অবশ্যই *ধর্মিষ্ঠঃ*। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের আদিলীলা পর্বে সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোনও এক ব্রাহ্মণের খুব উগ্রস্বভাব ছিল এবং সকলকে অভিশাপ দেওয়া তার বদভ্যাস ছিল বলে সবাই জানত; সে একদিন যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন, সেখানে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়নি, কারণ দরজা বন্ধ করা ছিল। সেই উগ্র ব্রাহ্মণ তখন রাগে উত্তেজিত হয়ে তার উপবীত ছিন্ন করে পরদিনই গঙ্গাতীরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অভিশাপ দিয়েছিল, "তোমার আচরণে আমি দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছি, তাই এখন আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। তোমার সমস্ত সুখ নষ্ট হোক।" অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনে মনে খুব উল্লাস বোধ করেছিলেন, যেহেতু তার লক্ষ্যই ছিল *'বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ'*—জড়জাগতিক সমস্ত সুখভোগ বর্জন করে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবৎভক্তির পথে নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করে থাকা। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঐ অভিশাপটিকে আশীর্বাদ বলেই মেনে নিয়েছিলেন, এবং তার অল্পদিনের মধ্যেই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাই এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, *আর্ষবচসা* তথা ব্রাহ্মণের কথায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস (*যদ্ অগাদ্ অরণ্যম্*) এবং বৃন্দাবন অভিমুখে এবং পরে দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার পথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষভাবেই ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মর্যাদা রক্ষা করতেই চেয়েছিলেন, তাই তিনি এই ব্রাহ্মণের অভিশাপটি অক্ষুণ্ণ রাখাই মনস্থ করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *মায়ামৃগম্* শব্দটির ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন—*মায়া* মানে মানুষের বিবাহিত স্ত্রী, পুত্রকন্যা এবং ব্যাঙ্কে জমানো টাকা, যেগুলি

মানুষকে জীবনের দেহাত্মবুদ্ধিজাত জড়জাগতিক ধারণার মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রেখে দেয়। *মৃগম্* শব্দটি বোঝায় *মৃগয়তি*, অর্থাৎ "অনুসন্ধান করে বার করা"। তাই, *মায়ামৃগম্* শব্দটি থেকে বোঝা যায়, বদ্ধ জীব সকল সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সমাজ, সখ্যতা এবং প্রেম-ভালবাসার দেহাত্মবুদ্ধিজাত ধারণায় একেবারে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ইন্দ্রিয় উপভোগের আকুল চেষ্টা করেই চলেছে। *অন্বধাবৎ* শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সকল সময়েই বদ্ধ অধঃপতিত জীবদের সন্ধানে নানাদিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধর্মভাবের উন্মাদনায় বা সখ্যতার অনুকূলে বদ্ধ জীবদের আলিঙ্গনাবদ্ধ করতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মহাপ্রভু ঐ সব বদ্ধ জীবদের শরীর স্পর্শ করে তাদের জড়জাগতিক অস্তিত্বের সমুদ্র থেকে তুলে এনে ভাবোল্লাসময় ভগবৎ-প্রেমের অমৃতসাগরে ভাসিয়ে দিতেন। এইভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন শ্রীভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপাময় এবং উদার মনোভাবাপন্ন অবতার, যাঁর করুণাধারা জাতি-ধর্ম-বর্ণের জাগতিক ভেদ-বিভেদের সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছিল।

দয়িতয়া শব্দটিকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সংস্কৃত *দয়া* শব্দটির অর্থ 'কৃপা'। এইভাবে, ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে, এই শ্লোকে ব্যবহৃত *দয়িতয়া* শব্দটি বোঝায় যে, বিশেষ কৃপাময় হওয়ার জন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সমস্ত অধঃপতিত বদ্ধ জীব শ্রীভগবানের মায়াময় বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত এবং বিভ্রান্ত, তাদের উদ্ধারকার্যেই ব্যস্ত হয়ে আত্মনিয়োগ করতেন। পরম করুণাময় হওয়ার এই গুণবৈশিষ্ট্য মহাপুরুষ, তথা পরমেশ্বর ভগবানেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্গীভূত হয়।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, এই শ্লোকটিতেও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতরণে তাঁর প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণ রূপের বর্ণনাই করা হয়েছে। এইভাবেই *সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং* শব্দসমষ্টি বোঝায় *শ্রীমথুরা-সম্পত্তিম্*, অর্থাৎ মথুরার ঐশ্বর্য। বৈদিক শাস্ত্রে মথুরাকে সকল ঐশ্বর্যের আধার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ ঐ ধামে শ্রীভগবানের পাদপদ্মের স্পর্শলাভ হয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মথুরার ঐশ্বর্যময় নগরীতে জন্মগ্রহণ করে থাকলেও, তিনি স্বয়ং বৃন্দাবনের বনানীময় গ্রামে চলে যান। এই প্রসঙ্গে *আর্যবচসা* শব্দটি বোঝায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ পিতামাতা বসুদেব ও দেবকীর আদেশ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৩/২২, ২৯) বসুদেব এবং দেবকী উভয়েই কংসের ভীতিপ্রদর্শনের ফলে তাঁদের আতঙ্কের কথা বলেন, কারণ কংস ইতিপূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সকলকেই বধ করে ফেলেছিল। তাই *আর্যবচসা* শব্দটি বোঝায় যে, গভীর ভালবাসা নিয়ে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন

যাতে কংসকে পরিহার করে চলবার মতো কোনও ব্যবস্থা করা যায়। আর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁদের আদেশ মান্য করার জন্যই, নিজে বৃন্দাবনের অরণ্যময় গ্রামে চলে যান (*যদগাদরণ্যম্*)।

এই প্রসঙ্গে, *মায়ামৃগম্* শব্দসমষ্টির দ্বারা শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিশেষ সমুন্নত সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে। *মায়া* শব্দটিও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া বোঝানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীমতী রাধারাণীর অকল্পনীয় প্রেমের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসেই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। তাই, *মৃগম্* অর্থাৎ 'পশু' বলতে এখানে *ক্রীড়ামৃগম্* বা 'একটি খেলনার পশু' বোঝানো হয়েছে। কোনও সুন্দরী বালিকা যেভাবে নানা ধরনের পুতুল নিয়ে খেলা করে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যেন অপরূপা সুন্দরী শ্রীমতী রাধারাণীর হাতে যেন পুতুলের মতোই হয়ে যান। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, শ্রীমতী রাধারাণী যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বিরহে জীবনধারণ করে থাকতে পারেন না, তাই শ্রীমতী রাধারাণী অসংখ্য প্রকার আরাধনা তথা প্রার্থনা অনুষ্ঠান করেছিলেন যাতে শ্রীকৃষ্ণকে আরও বেশী তাঁর কাছে বন্ধনে রাখা যেতে পারে। এইভাবেই, শ্রীমতী রাধারাণীর আরাধনার ফলেই, শ্রীকৃষ্ণ কখনই শ্রীবৃন্দাবনধাম ত্যাগ করে যেতে পারেন না। তিনি গোচারণ করে তাঁর সখাদের সাথে খেলা করে এবং শ্রীমতী রাধারাণী ও গোপীদের সঙ্গে অগণিত প্রেমলীলায় রত হয়ে বৃন্দাবনের এখানে সেখানে ছুটে বেড়াতেন। তাই *অন্বধাবৎ* শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণের বাললীলা, বৃন্দাবনের দিব্যধামের সর্বত্র তাঁর ছুটোছুটি সবই শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমের কঠোর বন্ধনাশ্রিত।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে শ্লোকটি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রেরও আবির্ভাব বর্ণনা করেছে। যদিও শ্রীভগবান সম্পূর্ণভাবে স্বরাট এবং সকল বিষয় থেকে নিরাসক্ত, তবুও তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রেমের আকর্ষণে আসক্ত হয়েই থাকেন। অযোধ্যার বিশাল রাজধানী শহরে নাগরিকদের সকলেই শ্রীরামচন্দ্রকে অবর্ণনীয়ভাবে ভালবাসতেন। এই প্রসঙ্গে *আর্যবচসা* শব্দটির অর্থ এই যে, তাঁর গুরুপ্রতিম পিতার আদেশে শ্রীরামচন্দ্র সর্বত্যাগী হয়ে বনে গমন করেন। সেখানে তিনি সীতাদেবীর জন্য গভীর স্নেহ ভালবাসা প্রদর্শন করেন এবং রাবণের দ্বারা মায়াবলে সৃষ্ট *মায়ামৃগম্* অর্থাৎ মায়াবী হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। এই সোনার হরিণটি বিশেষভাবে শ্রীমতী সীতাদেবী বাসনা করেছিলেন, তা *দয়িতয়েপ্সিতম্* শব্দটির মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

শ্রীভগবানের দিব্য শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যে অভিন্ন এবং পরস্পর সহায়ক, সেই বিষয়ে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩২) এইভাবে উল্লেখ আছে—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

পরমেশ্বর ভগবানের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (*অঙ্গানি*) *সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি* অর্থাৎ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ অন্য সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সমানভাবে সম্পন্ন করে থাকে। তাই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণপদ্মদ্বয় পরমেশ্বর ভগবানেরই অংশপ্রকাশ, এবং শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলের আরাধনা করে আরাধনাকারী অচিরেই দিব্য আনন্দসাগরে অবগাহন করতে থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অবতারের মধ্যে দিব্য গুণের কোনও প্রকার পার্থক্য নেই। বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে—*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্ (ব্রহ্মসংহিতা ৩৩)*। সুতরাং এই শ্লোকটি চমৎকারভাবে একই পরমতত্ত্বের তিনটি বিভিন্ন অভিপ্রকাশের চমৎকার গুণকীর্তন করেছে, সেই বিষয়ে আচার্যবর্গের মতামতের কোনও দ্বিধা নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবিসম্বাদিতভাবেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান। বৈদিকশাস্ত্রে যেভাবে পরম তত্ত্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাঁর দিব্য গুণাবলী সর্ববিষয়েই নিঃসন্দেহে তার সমকক্ষ। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের* আদিলীলা খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশদভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যসত্তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা পাঠক বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে পাঠ করতে পারেন।

প্রত্যেক মানুষেরই করভাজন মুনির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত এবং মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলের আরাধনা করা উচিত। মানসিক জল্পনা কল্পনা এবং খেয়ালখুশিমতো ব্যাখ্যা প্রদানের স্তরে সময় নষ্ট করা কারও উচিত নয়, বরং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে পরম তত্ত্বের সাথে মানুষের লুপ্ত সম্বন্ধ যথাযথভাবে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত। যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করে থাকেন তাঁরা বিস্ময়কর দিব্যফল লাভ করে থাকেন এবং কৃষ্ণপ্রেমের ফল আস্বাদন করে থাকেন। অতএব, *বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্*—আদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমলে বিনীতভাবে আমাদের প্রণতি জানাতে চাই, কারণ তিনিই যথার্থ একজন *মহাপুরুষ*, যাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* মধ্যে মহিমান্বিত করা হয়েছে।

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা সমর্থন করার মাধ্যমে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরাও তাঁর ষড়ভুজ রূপের ছয়টি বাহুসমন্বিত শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করে থাকেন। দুটি বাহু সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কমণ্ডলু এবং দণ্ড ধারণ করে, দুটি বাহু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধারণ করে, এবং দুটি বাহু শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্বাণ ধারণ করে থাকে। এই ষড়ভুজ রূপই *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটির যথার্থ তাৎপর্য প্রকাশ করে থাকে।

শ্লোক ৩৫

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্তিভিঃ ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **যুগ-অনুরূপাভ্যাম্**—(বিশেষ নাম ও রূপের মাধ্যমে) প্রত্যেক যুগের উপযোগী; **ভগবান্**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **যুগবর্তিভিঃ**—বিভিন্ন যুগের প্রত্যেকটির অধিবাসীদের দ্বারা; **মনুজৈঃ**—মানবজাতি; **ইজ্যতে**—পূজিত হয়; **রাজন্**—হে রাজা; **শ্রেয়সাম্**—সকল দিব্য কল্যাণে; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

এইভাবেই, হে রাজা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণপ্রদাতা। বিভিন্ন যুগে শ্রীভগবান যে সকল বিশেষ রূপ এবং নামের আধারে প্রকাশিত হন, বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

এখানে *যুগানুরূপাভ্যাং* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *অনুরূপা* মানে 'যথার্থ' কিংবা 'উপযোগী'। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আকুলভাবে বাসনা করে থাকেন যেন সকল বদ্ধ জীব সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগের উদ্দেশ্যে নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে। তাই, শ্রীভগবান সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই চারিযুগের প্রত্যেকটিতেই সেই যুগের মানবজাতির পক্ষে যথাযথভাবে আরাধনার উপযোগী রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *লঘুভাগবতামৃত* (*পূর্ব খণ্ড* ১/২৫) গ্রন্থে লিখেছেন—

কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তাঁর বর্ণ এবং নামানুসারে বর্ণিত হয়ে থাকেন, যেমন—শুক্ল (শ্বেত, অর্থাৎ অতীব শুদ্ধ) সত্যযুগে, এবং যথাক্রমে লাল, ঘননীল এবং

কালোরঙে ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগে।" তাই, যদিও বিভিন্ন যুগে শ্রীভগবানের মহিমা বর্ণনার উপযোগী বিভিন্ন নামে, যথা—সত্যযুগে হংস এবং সুপর্ণ, ত্রেতাযুগে বিষ্ণু এবং যজ্ঞ, আর দ্বাপর যুগে বাসুদেব ও সংকর্ষণ নাম তাঁকে অর্পণ করা হয়ে থাকে, তবু কলিযুগে সেই ধরনের নাম তাঁকে দেওয়া হয়নি, যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারত্বের তত্ত্ব লঘুভাবে প্রকাশের প্রয়াস পরিহার করা যায়।

কলিযুগে মানব সমাজ শঠতা এবং আড়ম্বরে জর্জরিত হয়ে থাকে। এই যুগে অনুকরণপ্রিয়তা এবং জালিয়াতির প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। সুতরাং বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারত্বের কথা গূঢ়, প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে উপযুক্ত প্রামাণ্য ব্যক্তিরাই তা অবগত হয়ে তারপরে পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য প্রচার করতে পারেন। বাস্তবিকই এই আধুনিক যুগে আমরা দেখি যে, বহু মূর্খ এবং সাধারণ মানুষও ভগবান কিংবা অবতার বলে নিজেদের পরিচয় জাহির করে থাকে। অনেক সহজলভ্য দর্শনকথা এবং শিক্ষা সংস্থাও হয়েছে, যেখানে যৎসামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে মানুষকে অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান কিংবা অবতার বানিয়ে দেওয়ার দাবি করা হয়ে থাকে। আমেরিকার মতো দেশেও কোনও একটি প্রখ্যাত ধর্মসংস্থা তার অনুগামীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে যে, তারা সকলেই স্বর্গধামে গিয়ে পরমেশ্বর ভগবান হয়ে যাবে। এই ধরনের ভিত্তিহীন অপপ্রচার খ্রিস্টধর্মের নামে চলছে। তাই, যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম বৈদিক শাস্ত্রে মুক্তভাবে বলা হয়, তা হলে অচিরেই ভেকধারী নকল অনেক চৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীতে ভরে উঠত।

সুতরাং, এই হট্টগোল প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে, কলিযুগের বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করতে হয়েছিল, এবং সরল, প্রচ্ছন্নভাবে বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামীদের কাছে বৈদিক মন্ত্রাবলীর মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের বিষয়টি জানানো হয়েছিল। কলিযুগে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের জন্য মনোনীত এই সুচারু ব্যবস্থাটি তিনি স্বয়ং প্রবর্তন করেছিলেন বলেই তা পৃথিবীগ্রহে বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। আর সমগ্র পৃথিবীব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষ শতসহস্র নকল চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে অসহনীয় বিব্রতবোধ না করেই শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ অনুশীলন করে চলেছে। যারা গভীর আন্তরিকতার সাথে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সমীপ্য লাভ করতে আগ্রহী, তারা অনায়াসেই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে, অথচ সন্দেহবাতিক জড়বাদী মূর্খেরা মিথ্যা মর্যাদাবোধের অহঙ্কারের ফলে এবং তাদের নগণ্য বুদ্ধিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম বুদ্ধির চেয়ে অনেক উন্নত মনে করার ফলে, জড় জগতে শ্রীভগবানের মহিমান্বিত

অবতরণের জন্য তাঁর অপূর্ব সুন্দর আয়োজনের মর্ম উপলব্ধি করতেই পারে না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ যদিও *শ্রেয়সাম্ ঈশ্বরঃ*, অর্থাৎ সকল প্রকার শুভদায়ী শ্রীভগবান, তা সত্ত্বেও ঐ ধরনের মূর্খেরা শ্রীভগবানের লক্ষ্যপথ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে এবং তাই জীবনে তাদের নিজেদেরই যথার্থ মঙ্গল সাধনে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৬

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ ৩৬ ॥

কলিম্—কলিযুগ; **সভাজয়ন্তি**—তাঁরা প্রশংসা করে থাকেন; **আর্যাঃ**—উন্নত শ্রেণীর মানুষেরা; **গুণজ্ঞাঃ**—(যুগের) যথার্থ মূল্য যাঁরা বোঝেন; **সারভাগিনঃ**—যাঁরা সারতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন; **যত্র**—যাতে; **সঙ্কীর্তনেন**—পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে; **এব**—শুধুমাত্র; **সর্ব**—সকল; **স্ব-অর্থঃ**—বাঞ্ছিত লক্ষ্য; **অভিলভ্যতে**—লাভ করা যায়।

অনুবাদ

যথার্থ জ্ঞানবান উন্নত শ্রেণীর মানুষেরা এই কলিযুগের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এই ধরনের জ্ঞানবান মানুষেরা কলিযুগের প্রশংসাই করে থাকেন, যেহেতু এই অধঃপতনের যুগে নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে অনায়াসেই জীবনের সকল বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগের মধ্যে কলিযুগই যথার্থ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই যুগেই শ্রীভগবান কৃপা করে কৃষ্ণভাবনামৃতের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবনার সারমর্ম অতি মুক্তভাবে বিতরণ করেছেন। *'আর্য'* শব্দটিকে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন "যিনি পারমার্থিক পথে উন্নত"। উন্নত মানুষের স্বভাবই জীবনের সারতত্ত্বের অনুসন্ধান করা। যেমন, জড় দেহের সারবস্তু কেবলমাত্র দেহটিই নয়, বরং দেহের অভ্যন্তরে যে চিন্ময় আত্মা রয়েছে, সেটাই সারবস্তু; অতএব যে কোনও বুদ্ধিমান মানুষ অস্থায়ী দেহটির চেয়ে নিত্যস্থায়ী আত্মার চিন্তাতেই বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকেন। তেমনই, কলিযুগটিকে কলুষতার সমুদ্র মনে করা হলেও, কলিযুগে মহাসৌভাগ্যেরও একটি সমুদ্র রয়েছে, তার নাম সঙ্কীর্তন আন্দোলন। পক্ষান্তরে, এই যুগের যতকিছু দোষত্রুটি, তা সবই শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের প্রথার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা যায়। তাই বৈদিকভাষায় বলা হয়েছে—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্ ॥

"সত্যযুগে ধ্যানের মাধ্যমে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের মাধ্যমে এবং দ্বাপর যুগে মন্দিরে উপাসনার মাধ্যমে যা অর্জন করা যায়, কলিযুগে ভগবান শ্রীকেশবের নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমেই তা লাভ হয়ে থাকে।"

স্থূল জাগতিক শরীরের সাথে আত্মপরিচয়ের অহঙ্কারজনিত অন্ধকার থেকে বদ্ধ জীব বৈদিক প্রথার মাধ্যমে ক্রমশই মুক্ত হতে থাকে এবং *অহং ব্রহ্মাস্মি* অর্থাৎ আত্মজ্ঞান উপলব্ধির পরিচয় লাভের অভিমুখে তখন অগ্রসর হতে পারে, অর্থাৎ তখন বদ্ধ জীব "আমি চিন্ময় আত্মা। আমি নিত্য স্বরূপ।" এই উপলব্ধি অর্জন করে। তখন মানুষকে আরও অগ্রসর হতে হয় যাতে বোঝা যায় যে, নিত্য স্বরূপ হলেও সকলের হৃদয়ে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি অনুপরমাণুর মধ্যেও পরমেশ্বর ভগবান পরম সত্তা রূপে বিরাজ করছেন, তিনিই সর্বোত্তম পরম সত্তা। আত্ম উপলব্ধির এই দ্বিতীয় পর্যায় এবং শেষ স্তরের পরম সার্থকতা অর্জন করতে হলে পরম দিব্যধামে ভগবান তথা পরম পুরুষোত্তমের উপলব্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হয়।

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান মূলত এই জগতের কেবল অধ্যক্ষই নন, বরং তাঁর রচিত সমগ্র বিশ্বেরই তিনি ভোক্তা, যা বদ্ধ জীবের সকল প্রকার কল্পনাশ্রিত স্বপ্নেরও অতীত। পরোক্ষভাবে বলা চলে, যদিও কোনও দেশের রাজা অথবা রাষ্ট্রপতিই সেই দেশের কারা বিভাগের প্রধান নিয়ন্তা, তবু রাজপ্রাসাদ কিংবা রাষ্ট্রপতি ভবনের মধ্যেই তিনি যথার্থ শান্তি সুখ উপভোগ করতে পারেন, নির্বোধ কারাবাসীদের দেখাশোনা করায় তিনি সেই সুখ পান না। ঠিক তেমনই, শ্রীভগবান জড়জাগতিক সৃষ্টিসম্ভার তদারকির জন্য তাঁর অধীনে দেবতাদের নিয়োগ করে থাকেন, যাঁরা শ্রীভগবানের নামে সেইগুলির পরিচালনা করে। শ্রীভগবান তখন তাঁর নিত্য দিব্য ধামে অনন্ত সুখ সাগরে শান্তি উপভোগ করতে থাকেন। এইভাবেই, শ্রীভগবানের নিজধামে অবস্থানের ধারণা অবশ্যই জড়জগতের কারাগারে শ্রীভগবানের প্রভুত্ব সম্পর্কে ধারণার চেয়ে অনেক উন্নত। শ্রীভগবানের সম্পর্কে এই ধরনের উপলব্ধি থেকে বোঝা যায় যে, চিন্ময় আকাশে অগণিত বৈকুণ্ঠলোক আছে এবং তার প্রত্যেকটিতে অগণিত শ্রীনারায়ণের সঙ্গে অসংখ্য ভগবদ্ভক্তদের বসবাসের ব্যবস্থা করা আছে। চিদাকাশের মূল গ্রহটিকে কৃষ্ণলোক বলা হয় এবং সেখানে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শ্রীগোবিন্দ রূপ প্রকাশ করেন। তাই ব্রহ্মা প্রতিপন্ন করেছেন— *গোবিন্দম্ আদি পুরুষম্ তমহং ভজামি।* ব্রহ্মা আরও বলেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)

তাই, কৃষ্ণপ্রেম অর্জন এবং চিদাকাশে কৃষ্ণ ধামে প্রবেশ করাই যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় জীবনের পরম সার্থকতা রূপে বিবেচনা করা উচিত। কলিযুগে সেই সার্থকতা সহজলভ্য হয়েছে শুধুমাত্র শ্রীভগবানের পবিত্র নাম—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥" এইভাবে নিরন্তর জপ করার মাধ্যমে। অতএব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে অভূতপূর্ব সুযোগ প্রত্যেক মানুষকে এনে দিয়েছেন, তা গুরুত্ব সহকারে সব মানুষেরই গ্রহণ করা উচিত। নিতান্ত অবিবেচক হতভাগ্য মানুষই এমন দিব্য সুযোগ অবহেলা করে।

শ্লোক ৩৭

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥ ৩৭ ॥

ন—হয় না; **হি**—অবশ্যই; **অতঃ**—এর চেয়ে (সংকীর্তন প্রক্রিয়া); **পরমঃ**—বৃহত্তর; **লাভঃ**—উপকার; **দেহিনাম্**—দেহাত্মার; **ভ্রাম্যতাম্**—ভ্রাম্যমান হয়ে থাকতে বাধ্য হয়; **ইহ**—এই জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র; **যতঃ**—যা থেকে; **বিন্দেত**—লাভ করে; **পরমাম্**—পরম; **শান্তিম্**—শান্তি; **নশ্যতি**—এবং বিনষ্ট হয়; **সংসৃতিঃ**—জন্ম ও মৃত্যুর আবর্ত।

অনুবাদ

অবশ্যই, এই জড় জগতের সর্বত্র ভ্রাম্যমাণ থাকতে বাধ্য বদ্ধ জীবাত্মাদের পক্ষে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সঙ্কীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে নিজের পরম শান্তি লাভ এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারার চেয়ে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা নেই।

তাৎপর্য

স্কন্দ পুরাণ তথা অন্যান্য পুরাণাদি মধ্যেও নিম্নরূপ বিবৃতি রয়েছে—*মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্বন্তি কীর্তনম্*। "কলিযুগে মহাভাগবত ভক্তগণ সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তন করে থাকেন।" পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান স্বভাবতই কৃপাময়, এবং যারা অসহায় অবস্থায় তাঁর শ্রীচরণপদ্মে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় গ্রহণ

করে, তাদের প্রতি বিশেষভাবেই কৃপালু হয়ে থাকেন। শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তনের মাধ্যমে মানুষ অচিরেই তাঁর শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। শ্রীল শ্রীধর গোস্বামীর অভিমত অনুসারে, সত্যযুগের মতো পূর্ববর্তী কোনও যুগেই কলিযুগের মতো সার্থক জীবন লাভের সুযোগ জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব হয়নি। শ্রীল জীব গোস্বামী এই বিষয়টি সম্পর্কে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সত্যযুগের মতো পূর্ববর্তী কালে মানুষের পূর্ণ যোগ্যতা ছিল এবং তাঁরা অনায়াসে বহু সহস্র বছর বাস্তবিকই আহার-নিদ্রা প্রায় বর্জন করেও বহু কঠোর পারমার্থিক প্রক্রিয়ায় ধ্যানমগ্ন থাকার অভ্যাস করতেন। তাই, যদিও যে কোনও যুগে শ্রীভগবানের পবিত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করলেই সকল সার্থকতা মানুষ লাভ করে থাকে, তা হলেও সত্যযুগের অতীব উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন বাসিন্দারা মনে করেন না যে, শুধুমাত্র জিহ্বা এবং ওষ্ঠ সঞ্চালন করে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তনই সর্বাঙ্গীন প্রক্রিয়া এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র আশ্রয় শ্রীভগবানের পবিত্র নাম। উন্নত আধুনিক প্রক্রিয়াসমন্বিত আসন পদ্ধতি, শ্বাস-প্রশ্বাসের আয়াসসাধ্য নিয়ন্ত্রণ এবং হৃদয়মাঝে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানচিন্তাই দীর্ঘসময় গভীরভাবে আত্মস্থ হয়ে থাকার কঠোর বিশদ যোগচর্চার অভ্যাস আয়ত্ত করার বিষয়েই তাঁরা বেশি আকৃষ্ট হন। সত্যযুগে পাপাচরণ পূর্ণ জীবনধারার কথা বস্তুত শোনা যায় না, তাই তখনকার মানুষ কলিযুগের মতো বিশ্বযুদ্ধ, মহামারী, মড়ক, খরা, মনোবিকার প্রভৃতির ভয়াবহ প্রকোপে আক্রান্ত হন না। যদিও সত্যযুগের লোকেরা জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতেন এবং নিষ্ঠাভরে ধর্মের নামে তাঁর বিধান মেনে চলতেন, তবে তাঁরা নিজেদের অসহায় মনে করতেন না, তাই সকল সময়ে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে একান্ত গভীর প্রেম ভালবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করতেন না।

তবে কলিযুগে জীবনধারণের অবস্থা এতই অসহনীয়, আধুনিক সরকার তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা এমনই ন্যক্কারজনক, শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির দ্বারা আমাদের শরীর এমনভাবে জর্জরিত, এবং নিজেদের যথাযথভাবে সুরক্ষিত রাখাও এমন সঙ্কটময় হয়ে উঠেছে যে, বদ্ধ জীব কাতরভাবে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম উচ্চস্বরে জপকীর্তনের মাধ্যমে, এই যুগের আগ্রাসন থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে চলেছে। এই যুগের মানব সমাজের মধ্যে মজ্জাগত ভয়ানক বৈসাদৃশ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের জীবনে অনুভূত হয়েছে এবং তাই তাঁরা দৃঢ়নিশ্চিত হয়েছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপালাভ ব্যতীত এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য কোনই সাফল্য অর্জন করা যাবে না। সারা পৃথিবীব্যাপী

ইসকনের কেন্দ্রগুলিতে আমরা চমৎকারভাবে ভাবোল্লাসময় কীর্তন অনুষ্ঠান করে থাকি, যাতে সকল শ্রেণীর নারী, পুরুষ এবং শিশুরাও বিস্ময়কর উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামকীর্তনের সঙ্গে নৃত্যগীত পরিবেশন করার সময়ে, সাধারণ জনগণের মন্তব্যের প্রতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্যের মনোভাব প্রকাশ করে। আমেরিকা ওবেরলিন কলেজের এক বিশিষ্ট অধ্যাপক ক্যালিফর্নিয়া শহরে একটি হরেকৃষ্ণ কেন্দ্রে এসেছিলেন এবং হরেকৃষ্ণ ভক্তগণ যেভাবে উৎসাহ সহকারে সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠানে পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন করছিল, তা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাই, কলিযুগের জীবগণ তাদের অসহায় এবং করুণ পরিস্থিতির জন্য, শ্রীভগবানের পবিত্রনামে তাদের সকল আশাভরসা ও বিশ্বাস স্থাপন করে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রনামের প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের বিপুল উদ্দীপনা অর্জন করেছে। কলিযুগ এই কারণেই সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, কারণ এই যুগেই, সত্যযুগ এবং অন্যান্য যুগের অপেক্ষাও, বদ্ধ জীবাত্মাগণ মায়াময় রাজ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে, শ্রীভগবানের পবিত্র নামেই পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে থাকে। পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের এই অবস্থাকেই *পরমাং শান্তিম্*, অর্থাৎ পরম শান্তিপূর্ণ মনোবৃত্তি বলে।

শ্রীল মধ্বাচার্য *স্বাভাব্য* নামে গ্রন্থ থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন, যাতে বলা হয়েছে যে, গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে পারমার্থিক সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যবর্গের মানসিকতা এবং সামর্থ্য বুঝতে সক্ষম হন এবং তাদের পক্ষে উপযোগী শ্রীভগবানের যথাযথ শ্রীবিগ্রহ উপাসনায় তাদের নিয়োজিত করে থাকেন। এইভাবেই পারমার্থিক গুরুদেব তাঁর শিষ্যবর্গের ভক্তিমার্গের সকল প্রকার বিঘ্ন নাশ করেন। সাধারণত নিয়ম আছে যে, বর্তমান যুগে প্রচলিত শ্রীভগবানের বিশেষ বিগ্রহেরই পূজা অবশ্য করা উচিত। অন্যান্য যুগে আবির্ভূত শ্রীভগবানের অন্যান্য রূপেরও উদ্দেশ্যে মানুষ প্রেমভক্তি নিবেদন করতে পারে, এবং বিশেষ করে সকল বিষয়ে বিঘ্ন বিপদ থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের পবিত্র নাম জপ করার জন্যও অনুমোদন করা হয়েছে। বাস্তবিকই এই সমস্ত অনুশাসনগুলি ইসকন আন্দোলনের মধ্যে অনুসরণ করা হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের মধ্যে সকল পুরুষ, স্ত্রী এবং শিশুরাই যে যার বিশেষ আচার-আচরণ ও প্রকৃতি অনুসারে ভগবদ্ভক্তি সেবা করে থাকে। তাছাড়াও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশানুসারে, দ্বাপর যুগে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামও বন্দনা করে থাকে, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রকৃত রূপ। সেই ভাবেই *দশাবতার* স্তোত্রে উল্লিখিত *জয় জগদীশ হরে* ভক্তিগীত সহকারেও এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমেও ইসকনের সদস্যবৃন্দ

পরমেশ্বর ভগবানের সকল প্রকার অংশপ্রকাশের আরাধনা করে থাকেন। আর প্রত্যেকবার আরতি অনুষ্ঠানের পরেই এই আন্দোলনের সংরক্ষণার্থে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে ভক্তি নিবেদন করা হয়, যাতে মানব সমাজের কল্যাণে এই সংস্থাটি নির্বিঘ্নে সেবা নিয়োজিত হয়ে থাকতে পারে।

শ্লোক ৩৮-৪০

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্ ।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ ॥ ৩৮ ॥
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী ॥ ৩৯ ॥
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর ।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ ॥ ৪০ ॥

কৃত-আদিষু—সত্য এবং অন্যান্য প্রথম দিকের যুগগুলির; **প্রজাঃ**—অধিবাসীগণ; **রাজন্**—হে রাজা; **কলৌ**—কলিযুগে; **ইচ্ছন্তি**—তারা ইচ্ছা করে; **সম্ভবম্**—জন্ম; **কলৌ**—কলিযুগে; **খলু**—অবশ্যই; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **নারায়ণ-পরায়ণাঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণের সেবায় ভক্তের জীবন উৎসর্গ; **ক্বচিৎ ক্বচিৎ**—এখানে সেখানে; **মহারাজ**—হে মহারাজ; **দ্রবিড়েষু**—দক্ষিণ ভারতে দ্রবিড় দেশে; **চ**—কিন্তু; **ভূরিশঃ**—বিশেষভাবে সমৃদ্ধ; **তাম্রপর্ণী**—তাম্রপর্ণী নামে; **নদী**—নদী; **যত্র**—যেখানে; **কৃতমালা**—কৃতমালা; **পয়স্বিনী**—পয়স্বিনী; **কাবেরী**—কাবেরী; **চ**—এবং; **মহাপুণ্যা**—অত্যন্ত পবিত্র; **প্রতীচী**—প্রতীচী নামে; **চ**—এবং; **মহানদী**—মহানদী; **যে**—যারা; **পিবন্তি**—পান করে; **জলম্**—জল; **তাসাম্**—এইগুলির; **মনুজাঃ**—মানবজাতি; **মনুজ-ঈশ্বর**—হে নরপতি (নিমি); **প্রায়ঃ**—অধিকাংশ; **ভক্তাঃ**—ভক্তগণ; **ভগবতী**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বাসুদেবে**—ভগবান শ্রীবাসুদেব; **অমল-আশয়াঃ**—নির্মল হৃদয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন, সত্যযুগ এবং অন্যান্য যুগের মানুষেরা পরমাগ্রহে এই কলিযুগে জন্ম গ্রহণ করতে চায়, যেহেতু এই যুগে পরমেশ্বর ভগবানের অনেক ভক্ত হবেন। বিভিন্ন স্থানে এই সকল ভক্তগণ আবির্ভূত হবেন, কিন্তু বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতেই অগণিত ভক্ত থাকবেন। হে নরপতি, কলিযুগে যে সকল মানুষ তাম্রপর্ণী,

কৃতমালা, পয়স্বিনী, অতীব পবিত্র কাবেরী এবং প্রতীচী মহানদীর জল পান করেন, তাঁরা অধিকাংশেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবাসুদেবের নির্মলহৃদয় ভক্ত হবেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রগুলিতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জীবন ধারণের পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি দেওয়া আছে। এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয়। যেমন, ভারতে এখন বসন্ত ঋতু চলতে থাকলেও, আমরা জানি যে, ভবিষ্যতে প্রবল গ্রীষ্ম আসবে, তারপরে বর্ষা ঋতু, শরৎ এবং অবশেষে শীতকাল এবং আবার এক বসন্ত কাল শুরু হবে। ঠিক এইভাবেই, আমরা জানি যে, এই ঋতুগুলি অতীতকালেও পুনরাবৃত্তি হয়ে চলত। ঠিক যেভাবে সাধারণ মানুষেরা পৃথিবীর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ঋতুগুলি বুঝতে পারে, তেমনভাবেই বৈদিক সংস্কৃতির মুক্তচিত্ত অনুগামীরাও অনায়াসেই পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহমণ্ডলীরও ঋতু অনুযায়ী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগের পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারতেন। সত্যযুগের অধিবাসীরা নিশ্চয়ই কলিযুগের অবস্থার কথা জানতেন। তাঁরা জানতেন যে, কলিযুগের কঠিন জড়জাগতিক অবস্থার ফলে জীবগণ বাধ্য হয়ে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এবং কলিযুগের অধিবাসীরা তাই অতি উচ্চশ্রেণীর ভগবৎ-প্রেম বিকাশ করতে পারে। তাই, সত্যযুগের অধিবাসীরা অন্য যুগের মানুষদের চেয়ে যদিও অনেক বেশি নিষ্পাপ, সত্যবাদী এবং আত্মসংযমী হতেন, তবু তাঁরা কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনের শুদ্ধতা উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে কলিযুগে জন্মগ্রহণ করতেই অভিলাষী হতেন।

ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত না হলে কেউ শ্রীভগবানের উত্তম ভক্ত হয়ে উঠতে পারে না। সুতরাং, কলিযুগের প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে অন্যান্য বৈদিক প্রথাগুলি লুপ্ত হলেও, এবং সকলের কাছেই সহজলভ্য শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনই একমাত্র প্রামাণ্য বৈদিক প্রথা হওয়া সত্ত্বেও, এই যুগে নিঃসন্দেহে অসংখ্য বৈষ্ণব ভগবদ্ভক্ত থাকবেন। ভক্তদের সাথে যাঁরা সঙ্গ লাভ করতে আগ্রহী হবেন, এই যুগে তাঁদের জন্মগ্রহণ করা বিশেষ অনুকূল হবে। বাস্তবিকই, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবীতে প্রামাণ্য বৈষ্ণব মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করছে যাতে অগণিত স্থানে মানুষ শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গ লাভ করতে পারে।

কেবলমাত্র আত্মসংযমী, নিষ্পাপ কিংবা বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞানে পণ্ডিত মানুষদের সাথে যথেষ্ট সঙ্গ লাভ করা ছাড়াও ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গলাভের উপযোগিতা অনেক বেশি মূল্যবান। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১৪/৫) বলা হয়েছে—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

"হে মহামুনি বহু লক্ষ কোটি মুক্ত প্রাণ এবং মুক্তি বিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধ মানুষদের একজন হয়ত ভগবান শ্রীনারায়ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হতে পারেন। তেমন ভক্তেরাই সম্পূর্ণ শান্ত স্বভাব হন এবং তাঁরা অতি দুর্লভ ব্যক্তিত্ব।" তেমনই, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*মধ্য* ২২/৫৪) গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে—

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

"সমস্ত দিব্য শাস্ত্রাদিতেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, শুদ্ধভক্তের সাথে একমুহূর্তমাত্রও সঙ্গলাভ করতে পারলে, যে কোনও মানুষের সকল বিষয়ে সার্থকতা লাভ হয়।"

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত অনুযায়ী, এই শ্লোকটির মধ্যে *ক্বচিৎ ক্বচিৎ* শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়দেশের নদীয়া জেলায় আবির্ভূত হবেন। আর এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে তিনি ক্রমশ ভগবৎপ্রেমের বন্যা ধারা প্লাবিত করে সমগ্র পৃথিবী ঢেকে দেবেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রমুখ অনেক উন্নত ভগবদ্ভক্তও গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করেন।

কৃষ্ণকীর্তন তথা পবিত্র কৃষ্ণনাম জপের প্রক্রিয়া কলিযুগেই সীমাবদ্ধ নয়। *বিষ্ণুধর্ম* গ্রন্থে এক ক্ষত্রিয়ের অধঃপতিত সন্তানের কাহিনী প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধকঃ॥

"যখন কেউ শ্রীহরির নাম জপকীর্তনে উৎসুক হয়ে ওঠে, তখন প্রসাদ ইত্যাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও স্থান কালের বিধিনিষেধ থাকে না।" তেমনই, *স্কন্দপুরাণে* বলা হয়েছে, এবং *বিষ্ণুধর্ম* ও *পদ্মপুরাণের বৈশাখ মাহাত্ম্য* খণ্ডেও উল্লেখ করা আছে যে, *চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীর্তয়েৎ*—"পরমেশ্বর ভগবান যিনি চক্রধারী, তাঁকে সর্বদা সর্বত্র গুণকীর্তনের মাধ্যমে আরাধনা করা উচিত।" এইভাবেই, *স্কন্দপুরাণে* বলা হয়েছে—

ন দেশকালাবস্থাত্মশুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতৎ নাম কামিতকামদম্॥

"শ্রীভগবানের নাম জপকীর্তনের জন্য স্থান, কাল, পরিবেশ পরিস্থিতি, আনুপূর্বিক আত্মশুদ্ধি কিংবা অন্য কোনও বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। বরং, অন্য সকল পদ্ধতির চেয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বয়ংসিদ্ধ এবং একাগ্রমনে জপকারী মানুষের সকল মনোবাঞ্ছা এর মাধ্যমে সাফল্যমণ্ডিত হয়।"

এইভাবে *বিষ্ণুধর্ম* রচনার মাধ্যমে বলা হয়েছে—

কলৌ কৃতযুগং তস্য কলিস্তস্য কৃতে যুগে ।
যস্য চেতসি গোবিন্দোহৃদয়ে যস্য নাচ্যুতঃ ॥

"যার হৃদয় মাঝে ভগবান শ্রীগোবিন্দের অবস্থান, তার জীবনে কলিযুগের মধ্যেও সত্যযুগ বিকশিত হয়, এবং বিপরীতক্রমে সত্যযুগও কলিযুগে রূপান্তরিত হয়ে যায়—যদি কারও হৃদয়ে অচ্যুত শ্রীভগবানের চিন্তার কোনও মর্যাদা থাকে না।" শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম সর্বত্র শক্তিমান, সর্বদা এবং সকল পরিবেশেও তা বিদ্যমান; তাই কলিযুগে হোক, সত্যযুগে হোক, স্বর্গে হোক নরকে হোক, কিংবা বৈকুণ্ঠেই হোক, সদা সর্বদাই শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তন করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম তাঁর পরম সত্তা থেকে অভিন্ন, এবং শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান। তাই, এই নয় যে, অন্য কোনও প্রক্রিয়া কার্যকরী হওয়ার ফলেই পবিত্র কৃষ্ণনাম এই যুগেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বলা হয়েছে যে, ধ্যানযোগের মাধ্যমে ভগবানকে শুধুমাত্র স্মরণ করার চেয়ে ভগবানের পবিত্র নামাদি জপকীর্তন অভ্যাস করা অনেক বেশি শক্তিশালী প্রক্রিয়া। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/১১) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

এতান্ নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতাম্ অকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপং নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥

"হে রাজন, মহান যোগীগণের দ্বারা নির্ণীত পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম নিত্য জপকীর্তন করলে নিঃসন্দেহে সকলের জীবনেই নির্ভয়ে সাফল্য লাভের পথ প্রদর্শিত হয়, এমনকি যারা সকল প্রকার জড়জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছে, যারা সকল প্রকার জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগে আগ্রহী রয়েছে, এবং যারা দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে আত্মতৃপ্ত হয়েছে, তাদের সকলেরই জীবন সুখময় হয়ে উঠে।" *ভাগবতের* এই শ্লোকটি সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর তাৎপর্য প্রদান প্রসঙ্গে লিখেছেন—"শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর অভিমত অনুসারে, পবিত্র নাম জপকীর্তনের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের পন্থাটি প্রতিষ্ঠিত সর্বজনস্বীকৃত সত্য, সেকথা শুধুমাত্র তিনিই করেছেন, তা নয়, পূর্ববর্তী অন্য সকল আচার্যবর্গও তা সমর্থন করেছেন। সুতরাং এই বিষয়ে অধিকতর প্রমাণের আর কোনও প্রয়োজন নেই।" শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তনের বিশদ ব্যাখ্যা সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের লেখা এই শ্লোকটির তাৎপর্য পাঠকবর্গ পর্যালোচনা করে অনুধাবন করতে পারেন এবং ঐভাবে নাম জপকীর্তনের অপরাধগুলি বর্জনের বিষয়ে অবহিত হতেও পারবেন।

বৈষ্ণব-চিন্তামণি গ্রন্থে নিম্নরূপ বিবৃতি রয়েছে—

অঘাচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্দুষ্করায়াসেন সাধ্যতে ।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনং তু ততো বরম্ ॥

"শ্রীবিষ্ণু স্মরণের মাধ্যমে যদিও সকল প্রকার পাপ নাশ করা সমর্থ হয়, তবুও তা বহু আয়াসসাধ্য। অথচ শুধুমাত্র ওষ্ঠ সঞ্চালনের মাধ্যমেই কৃষ্ণনামকীর্তন করা যায় এবং তাই এই প্রক্রিয়াটিই শ্রেষ্ঠ।" শ্রীল জীব গোস্বামীও নিম্নরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমার্চিতঃ ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥

"হে ভরত বংশের অনুগামী, যে ব্যক্তি শত শত পূর্বজন্মে নিষ্ঠাভরে শ্রীবাসুদেবের আরাধনা করছে, তারই মুখে সদাসর্বদা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র নাম বিরাজ করতে থাকে।" একই ধরনের ভাবধারা শ্রীমতী দেবহূতি তাঁর পুত্র কপিলমুনিকে যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন, তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বিধৃত হয়েছে—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

"আহা, আপনার পবিত্র নাম যাদের জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হয়ে থাকে, তারা কতই না মহিমান্বিত! তারা চণ্ডালের পরিবারে জন্ম নিয়ে থাকলেও, সেই সব মানুষ পূজনীয়। যে সব মানুষ আপনার পবিত্র নাম জপকীর্তন করেন, তাঁরা অবশ্যই সমস্ত প্রকার কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন, এবং আর্যগণের সকল সদাচার আয়ত্ত করেছেন। আপনার পবিত্র নাম জপের মাধ্যমে তীর্থ স্নানাদি সম্পন্ন করেছেন, বেদশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছেন এবং সর্বপ্রকার গুণাবলী আয়ত্ত করেছেন।" (*ভাগবত* ৩/৩৩/৭)

সুতরাং, শ্রীল জীব গোস্বামী উপসংহারে লিখেছেন যে, সকল যুগেই সমান ভাবে কীর্তনানুষ্ঠান করা চলে। কলিযুগে অবশ্য পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে স্বয়ং জীবগণকে তাঁর পবিত্র নাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন—

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি' ।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥

"হে বদ্ধ জীবগণ, যারা মূর্খের মতো মায়াপিশাচীর কোলে নিদ্রামগ্ন রয়েছ, আমি তোমাদের মায়াময় ব্যাধি সারানোর জন্য চমৎকার ঔষধ এনেছি। এই ঔষধের পরিচয় 'হরিনাম'। এটি আমারই পবিত্র নাম, এবং এই ঔষধ গ্রহণে তোমরা জীবনের সর্ববিষয়ে সার্থকতা লাভ করবে। তাই, বিশেষভাবে আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, কৃপা করে এই ঔষধ তোমরা গ্রহণ করো, যা আমি নিজে তোমাদের জন্যই নিয়ে এসেছি।"

এই অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে বলা হয়েছিল, *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।* শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, *সংকীর্তনপ্রায়ৈঃ*—শব্দগুলির অর্থ "বিশেষত সংকীর্তন প্রথার মাধ্যমে", যার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কলিযুগে যদিও অন্যান্য ধরনের পূজা, যেমন শ্রীবিগ্রহ আরাধনা অনুষ্ঠিত হতে পারে, তবে যথার্থ সার্থকতা অর্জন করতে হলে, শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের সঙ্গে অবশ্যই ভালভাবে সংযোগ সাধন প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজারীকে অবশ্যই জানতে হবে যে, এই ধরনের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল অবিরাম শ্রীভগবানের পবিত্র নামকীর্তন। পক্ষান্তরে, যিনি শ্রীভগবানের নাম জপকীর্তন নিষ্ঠাভরে যথাযথভাবে পালন করেছেন, তাঁকে অন্য কোনও পদ্ধতিতে আর নির্ভর করতে হয় না, সেকথা নিম্নলিখিত বিখ্যাত মন্ত্রটির মধ্যে জানানো হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"এই কলিযুগে ভগবানের পবিত্র হরিনাম ছাড়া পারমার্থিক উন্নতির অন্য কোনও বিকল্প নেই, অন্য কোনও বিকল্প নেই, অন্য কোনও বিকল্প নেই।" (*বৃহন্নারদীয় পুরাণ* ৩৮/১২৬) এই সকল প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভাগবতের উক্তি (*কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যাঃ*) অনুসারে এই যুগে যে সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তার ফলে পারমার্থিক দিব্য ভাবাপন্ন মানুষেরাও কলিযুগের বন্দনা করে থাকেন, তা মোটেই স্ববিরোধী মন্তব্য নয়।

এই অধ্যায়ের শ্লোক ৪০-এর শেষে বলা হয়েছে, *প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ*—দক্ষিণ ভারতের পবিত্র নদীগুলির জলধারা যারা নিয়মিতভাবে পান করতে সক্ষম হয়, সাধারণত তারা ভগবান শ্রীবাসুদেবের নির্মলচিত্ত ভক্ত হয়ে উঠবে। *প্রায়ঃ*, অর্থাৎ "সাধারণত" শব্দটি বোঝায় যে, যারা ভগবদ্ভক্তদের প্রতি

অপরাধমূলক আচরণ করে থাকে, অথচ নিজেদের ভক্ত বলে জাহির করে, তারা *অমলাশয়াঃ*, অর্থাৎ নির্মলচিত্ত মানুষ বলে গণ্য হয় না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের আপাত দারিদ্রপ্রপীড়িত দুরবস্থা দেখে কেউ যেন বিভ্রান্ত বোধ না করেন। এমন কি আজও এই শ্লোকে উল্লিখিত স্থানগুলির অধিবাসীরা সাধারণত অতি সামান্য আহারে এবং ব্যসনভূষণে তাদের দিনাতিপাত করে থাকে আর পরমেশ্বর ভগবানের মহান ত্যাগী ভক্তদের মতোই বসবাস করে। পক্ষান্তরে বলা চলে, পোশাকে-আসাকে মানুষকে চেনা যায় না। মার্জিত সুবেশা পশুর মতো বাস করলে, দামি জামা-কাপড় পরলে আর রাজসিক খাদ্যদ্রব্যে রসনাতৃপ্ত করলেই সেগুলিকে উন্নত পরমার্থবাদী মানুষের লক্ষণ বলে স্বীকার করা চলে না। যদিও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা সাধারণত শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবভক্ত, তা হলেও তাঁদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরই অনুগামী ভগবদ্ভক্ত রূপে স্বীকার করা হয়ে থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, তাঁদের সহজ সরল জীবনধারা অবশ্যই সদ্‌গুণরূপে গণ্য হওয়া উচিত, তা কোনওভাবেই অযোগ্যতার পরিচায়ক নয়।

শ্লোক ৪১

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥ ৪১ ॥

দেব—দেবতাদের; **ঋষি**—ঋষিদের; **ভূত**—সাধারণ জীব; **আপ্ত**—মিত্র এবং আত্মীয়; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষদের; **পিতৃণাম্**—পিতৃপিতামহদের; **ন**—না; **কিঙ্করঃ**—ভৃত্য; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **ঋণী**—ঋণী; **চ**—ও; **রাজন্**—হে রাজা; **সর্ব-আত্মনা**—তাঁর সর্বাত্মকভাবে; **যঃ**—যে মানুষ; **শরণম্**—আশ্রয়; **শরণ্যম্**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, যিনি সকলের আশ্রয়দাতা; **গতঃ**—প্রার্থিত; **মুকুন্দম্**—শ্রীমুকুন্দ; **পরিহৃত্য**—পরিত্যাগ করে; **কর্তম্**—কর্তব্যাদি।

অনুবাদ

হে রাজন্, যিনি সকল প্রকার জড়জাগতিক কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং সকলের আশ্রয়দাতা শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি কোনও দেব-দেবতা, মুনিঋষি, সাধারণ জীব, লোকজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মানবজাতি কিংবা পরলোকগত পিতৃপুরুষদের কাছেও কোনওভাবে ঋণী হয়ে

থাকেন না। যেহেতু ঐ সমস্ত শ্রেণীর জীবগণই পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশমাত্র, তাই শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিবেদিত মানুষকে আর ঐ সমস্ত মানুষদের পৃথকভাবে সেবা করবার প্রয়োজন থাকে না।

তাৎপর্য

ভগবৎ-সেবায় ভক্তিমূলক অনুশীলনের পন্থায় যে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেনি, নিঃসন্দেহে তাকে অনেক জড়জাগতিক কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করতেই হয়। প্রত্যেক সাধারণ বদ্ধ জীবকেই দেবতাদের দেওয়া অগণিত উপকার গ্রহণ করতে হয়, চন্দ্র-সূর্যের কিরণ, বৃষ্টি, বাতাস, খাদ্য এবং সর্বোপরি, জড় দেহটিও দেবতাদের কৃপায় সচল থাকে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *স্তেন এব সঃ*—দেবতাদের দানের বিনিময়ে মানুষ যজ্ঞের মাধ্যমে প্রতিদান অর্পণ না করলে, সে *স্তেন* অর্থাৎ চোর হয়ে থাকে। সেইভাবেই, অন্যান্য জীবেরাও, যেমন গাভীরা নানাপ্রকার অগণিত উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী আমাদের জন্য দিয়ে থাকে। যখন আমরা সকালে উঠি, তখন পাখিদের মিষ্ট কলতানে আমাদের মন সজীব হয়ে ওঠে, এবং গরমের দিনে বনের গাছপালার ছায়া আর ঠাণ্ডা বাতাসে আমরা বিশ্রাম উপভোগ করি। অগণিত জীবের কাছ থেকে আমরা কত রকমের সেবা আদায় করে ভোগ করি এবং তাদের সেগুলির প্রতিদানে কিছু দেওয়াই আমাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য। *আপ্ত* মানে নিজের পরিবার-পরিজন, যাদের প্রতি স্বাভাবিক ন্যায়নীতি অনুসারেই মানুষ অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকে, এবং *নৃণাম্* মানে মানব সমাজ। পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত না হওয়া পর্যন্ত, মানুষ অবশ্যই তার সমাজের একটি উপকরণ মাত্র হয়ে থাকে। যে সমাজে আমরা বাস করি, সেখান থেকে আমরা সুলভ শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং নিরাপত্তা আমরা গ্রহণ করে থাকি, এবং এইভাবেই আমরা সমাজের কাছে বিপুলভাবে ঋণী হয়ে যাই। অবশ্য, সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং আমাদের যেসব পূর্বপুরুষেরা সযত্নে নৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতি সংরক্ষণ করে গেছেন যাতে তাঁদের বংশধর রূপে আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারি, তাঁদের প্রতিও আমাদের ঋণ প্রত্যর্পণের কর্তব্য থাকে। তাই *পিতৃণাং* অর্থাৎ "পিতৃপুরুষগণ" শব্দটি পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে আমাদের ঋণের কথাই বোঝায়।

বাস্তবিকই, কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যদের প্রায়ই জড়জাগতিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের কাছ থেকে সমালোচনা শুনতে হয় যে, উপরে উল্লিখিত সমস্ত দায়দায়িত্বগুলি যথাযথভাবে পালন না করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। এর উত্তরে *ভাগবতে* (৪/৩১/১৪) বলা হয়েছে, *যথা*

তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধ ভুজোপশাখাঃ। যদি কেউ বৃক্ষ মূলে জল সিঞ্চন করে, তবে আপনা হতেই শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প ইত্যাদি সবই পুষ্টি লাভ করে। পৃথকভাবে গাছের শাখা-প্রশাখা এবং পত্রপুষ্পে জল দেওয়ার কোনই প্রয়োজন হয় না, কিংবা তাতে কোনও কাজ হয় না। তরুমূলে শিকড়ে জল দিতে হয়। ঠিক সেইভাবেই, *প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাম্*—খাদ্যসামগ্রী উদরস্থ করতে হয়, যেখান থেকে তা আপনা হতেই শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিবেশিত হয়ে যায়। শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খাদ্যসামগ্রী ঘর্ষণের মাধ্যমে পুষ্টি সরবরাহের সব রকমের চেষ্টাই বাতুলতা মাত্র। ঠিক সেইভাবেই, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল সৃষ্টির মূল সূত্র এবং উৎস। সবই শ্রীকৃষ্ণ থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণ পোষণ করেন, এবং শেষে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবেরই পরম কল্যাণময় সখা, ত্রাতা এবং শুভকামী, আর যদি তিনি প্রীতিলাভ করেন, তা হলেই সারা জগৎ আপনা হতেই প্রীতিলাভ করবে, ঠিক যেমন উদরে যথাযথভাবে খাদ্যসামগ্রী পাঠালেই সমস্ত শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গও শক্তিলাভ ও পুষ্টিলাভ করে থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোনও মহারাজের প্রধান অমাত্য হয়ে যে কাজ করছে, ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের প্রতি তার আর কোনও দায়দায়িত্ব থাকে না। নিঃসন্দেহে কোনও সাধারণ মানুষের জীবনে এই জড়জগতের মধ্যে অনেক রকম বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু *ভগবদ্গীতা* অনুসারে, *ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্*—প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানই সকল প্রকার কল্যাণ বিতরণ করে থাকেন। যেমন, জীবমাত্রেই তার পিতামাতার কাছ থেকেই তার শরীরটি লাভ করে। অবশ্য, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, কোনও বিশেষ পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক কোনও সময়ে বন্ধ্যা হয়ে পড়ে। কখনও বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নেয়, আবার কখনও মৃত অবস্থায় শিশুর জন্ম হয়। প্রায়ই মৈথুন ক্রিয়া ব্যর্থ হলে সন্তান সম্ভাবনা একেবারেই বিফল হয়ে যায়। তাই যদিও সমস্ত পিতামাতাই সুন্দর, উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন সন্তান লাভের আশা করে থাকে, প্রায়ই তা ঘটে না। তাই বোঝা যেতে পারে যে, কোনও পুরুষ এবং নারী যে মৈথুন ক্রিয়ার মাধ্যমে সন্তান সৃষ্টিতে সক্ষম হয়, সেটা শেষ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাতেই সম্ভব হয়ে থাকে। শ্রীভগবানের কৃপাতেই পুরুষ মানুষের শুক্রবীর্য নিক্ষেপ এবং নারীর ডিম্বকোষের উর্বরতা সম্ভব হয়। তেমনই, ভগবানের কৃপাতেই শিশু সুস্বাস্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তার নিজের জীবনপথে এগিয়ে চলার জন্য শারীরিক পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। যদি কোনও একটি পর্যায়ে মানুষের ক্রমবিকাশের মাঝে ভগবানের কৃপালাভ ব্যাহত হয়, তা হলেই অকস্মাৎ মৃত্যু কিংবা বিকলাঙ্গ ব্যাধি হয়।

দেবতারাও স্বাধীন স্বতন্ত্র নন। *পরিহৃত্য কর্তম্* শব্দগুলির দ্বারা বোঝায় "অন্যান্য কর্তব্যাদি পরিহার", অর্থাৎ দেবতারা যে শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন, এই ধরনের যে কোনও ভাবধারা পরিহার করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানেরই বিশ্বরূপসম শরীরেরই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। তা ছাড়া, *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং বুদ্ধি ও স্মৃতি সবকিছু একমাত্র তিনিই প্রদান করেন। তাই, আমাদের প্রপিতাগণ যাঁরা সযত্নে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছেন, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রদত্ত বুদ্ধির সাহায্যেই তা করেছিলেন। অবশ্যই তাঁরা তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে তা করেননি। মস্তিষ্ক ছাড়া কেউ বুদ্ধিমান হতে পারে না, এবং শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় আমরা মানব মস্তিষ্ক পেয়ে থাকি। সুতরাং, যদি আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের প্রতি আমাদের নানা প্রকার অসংখ্য দায়দায়িত্বের কথা সবকিছু সযত্নে বিশ্লেষণ করি, তা হলে আমরা দেখব যে, প্রত্যেকটি বিষয়েই একমাত্র পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই কৃপায় আমরা জীবনে যা কিছু বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করে থাকি। তাই কোনও সাধারণ মানুষ তার অনুকূলে যারা উপকার করেছে, তাদের ক্ষেত্রে বিবিধ দায়দায়িত্ব পূরণের জন্য অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণ ও দানধ্যানমূলক ক্রিয়াকর্ম অবশ্যই পালন করতে থাকলেও, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে যিনি ভক্তিমূলক সেবা নিবেদন করে থাকেন, তিনি অচিরেই সেই ধরনের সকল প্রকার দায়দায়িত্ব পূরণ করতে সক্ষম হন, যেহেতু সকল প্রকার আশীর্বাদ ও কল্যাণ শেষ পর্যন্ত শ্রীভগবানের কাছ থেকেই বিভিন্ন প্রকারে পরিবারবর্গ, প্রপিতাপিতৃমহ, দেবতামণ্ডলী প্রমুখ মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে।

দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যে, রাজ্য সরকার কখনও কিছু কিছু সুবিধা বিতরণ করে থাকতে পারে, যা মূলত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাঠানো হয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সচিব কিংবা মন্ত্রী যিনি থাকেন, তাঁর পক্ষে রাজ্য সরকারের স্বল্পমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিনিধিদের প্রতি আর কোনও দায়দায়িত্ব থাকে না। সুতরাং, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২০/৯) বলা হয়েছে—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

"যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ না হবে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে ভক্তিভাবসম্পন্ন সেবার মাধ্যমে শ্রবণ ও কীর্তনাদি অনুষ্ঠানের রুচি জাগাতে না পারে, ততদিন তাকে বৈদিক অনুশাসনাদি অনুসারে বিধিবদ্ধ

ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করতে হয়।" উপসংহারে বলা চলে যে, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিসেবা নিবেদনের মাধ্যমে যে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে, তাকেই শ্রেষ্ঠ মানুষ বলা চলে।

সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র দেবতাগণ, পরিবারবর্গ এবং সমাজের কাছ থেকেই উপকার পেতে চায়, যেহেতু সেইগুলি জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অনুকূল হয়ে থাকে। স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সেই ধরনের জাগতিক প্রগতিকেই জীবনের লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে থাকে, এবং তাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভক্তিসেবা নিবেদনের মহান মর্যাদা বুঝতে পারে না। ভক্তিযোগ অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবার অনুশীলন বলতে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য ইন্দ্রিয়াদির সন্তুষ্টি বিধানের উদ্যোগ বোঝায়। পরমেশ্বর ভগবানেরও দিব্য ইন্দ্রিয়াদি আছে, ঈর্ষাক্লিষ্ট জড়জাগতিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা তা অস্বীকার করে নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করে থাকে। অবশ্য, ভগবদ্ভক্তেরা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় রূপ, শক্তি, সম্পদ, এবং কারুণ্যের প্রতি সন্দেহ পোষণের মাধ্যমে কাল হরণ করে না, বরং প্রত্যক্ষভাবেই তারা শ্রীভগবানের দিব্য ইন্দ্রিয়াদির প্রীতিবিধানের প্রয়াসে উদ্যোগী হয় এবং সেইভাবেই নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পরম আশীর্বাদ লাভ করে থাকে। ভগবদ্ভক্তেরা ভগবদ্ধামেই ফিরে যান, যেখানে জীবন সচ্চিদানন্দময়। কোনও দেবতা, পরিবার পরিজন কিংবা পিতৃপুরুষেরও সচ্চিদানন্দ জীবন প্রদানের কোনও সাধ্য নেই। তবে যদি কেউ মূর্খের মতো পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমলের আরাধনায় অবহেলা করে, এবং তার পরিবর্তে অনিত্য জড়জাগতিক দেহটিকেই সর্বস্ব জ্ঞান করে, তা হলে তাকে অবশ্যই বিশদভাবে যাগযজ্ঞাদি, পূজাব্রত সাধন, কৃচ্ছ্রতা পালন, এবং দানধ্যানের মাধ্যমে উল্লিখিত সকল প্রকার দায়দায়িত্ব অনুসরণ করতেই হবে। অন্যথায়, মানুষ সম্পূর্ণ পাপের ভাগী এবং নিন্দনীয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকে জড়জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারের মাধ্যমে।

শ্লোক ৪২

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্-
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৪২ ॥

স্বপাদমূলম্—ভক্তবৃন্দের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল; **ভজতঃ**—যিনি ভজনা করেন; **প্রিয়স্য**—শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়জন; **ত্যক্ত**—ত্যাগ করে; **অন্য**—অপরের;

ভাবস্য—যার ভাব অথবা অভিরুচি মতো; **হরিঃ**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **পর-ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিকর্ম**—পাপকর্মাদি; **যৎ**—যা কিছু; **চ**—এবং; **উৎপতিতম্**—সংঘটিত হয়; **কথঞ্চিৎ**—কোনও ভাবে; **ধুনোতি**—বিদূরিত হয়; **সর্বম্**—সকল; **হৃদি**—হৃদয়ে; **সন্নিবিষ্টঃ**—প্রবিষ্ট।

অনুবাদ

এইভাবে যিনি অন্য সকল প্রকার ক্রিয়াকর্ম বর্জন করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি ভগবানের অতীব প্রিয়জন। তবে, যদি ঐ ধরনের কোনও আত্মসমর্পিত জীব ঘটনাচক্রে কোনও পাপকর্ম করে থাকে, তা হলে সকলের হৃদয়াসনে বিরাজিত পরমেশ্বর ভগবান অচিরেই সেই ধরনের পাপের কর্মফল হরণ করে নিয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত কোনও ভক্তকে সাধারণ জড়জাগতিক কর্তব্য পালন করবার প্রয়োজন হয় না। এখন এই শ্লোকটিতে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি সেবার অনুশীলন এমনই পবিত্র এবং শক্তিশালী যে, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পিত ভক্তের পক্ষে অন্য কোনও প্রকার প্রায়শ্চিত্ত মূলক ক্রিয়াকর্মাদি সাধন করবার প্রয়োজনই হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ষষ্ঠ স্কন্ধে তাই বিবৃত হয়েছে যে, ঘটনাক্রমে কোনও পাপময় ক্রিয়াকর্মে জড়িত হয়ে পড়লেও আত্মসমর্পিত ভগবদ্ভক্তকে কোনও প্রকার প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে হয় না। যেহেতু ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনই এমনভাবে অতীব পরিশুদ্ধ পদ্ধতি যে, শুদ্ধ ভক্ত ঘটনাচক্রে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকলে অনতিবিলম্বেই শ্রীভগবানের চরণকমলে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে আবার নিয়োজিত হয়। আর এইভাবেই শ্রীভগবান তাকে রক্ষা করে থাকে, সেকথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) উল্লেখ করা হয়েছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

এই শ্লোকটিতে *ত্যক্তান্য ভাবস্য* শব্দটি অতিশয় অর্থবহ। পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করে থাকেন যে, ব্রহ্মা এবং শিবসমেত সমস্ত জীব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশমাত্র এবং তাই তাঁদের কোনও ভিন্ন কিংবা স্বাধীন সত্তা নেই। প্রত্যেক জিনিস এবং প্রত্যেক জীব শ্রীভগবানেরই অভিন্ন সত্তা উপলব্ধি হওয়ার ফলে, ভগবদ্ভক্ত কখনই শ্রীভগবানের আদেশ অমান্য করে কোনও প্রকার পাপকর্ম অনুষ্ঠানে আপনা থেকেই

বিরত থাকেন। তবে জড়জাগতিক প্রকৃতির প্রচণ্ড প্রভাবে শুদ্ধ নিষ্ঠাবান কোনও ভক্তও হয়তো ক্ষণকালের জন্য মায়ার প্রভাবান্বিত হয়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির কঠোর পথ থেকে বিচ্যুত হতেও পারেন। তেমন ক্ষেত্রে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, ভক্তের হৃদয়মাঝে বিরাজিত হয়ে, সেই সকল পাপকর্ম বিদূরিত করে থাকেন। এমনকি, মৃত্যুর অধিপতি যমরাজের পক্ষেও আত্মসমর্পিত কোনও ভগবদ্ভক্তের আকস্মিক পাপকর্মের ফলে শাস্তিদানের ক্ষমতা থাকে না। উপরে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ হলেন *পরেশ*, অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীভগবান, তাই ভগবানের আপন ভক্তদের শাস্তির বিধান দেওয়া কোনও অধঃস্তন দেবতাদের সাধ্যের অতীত। যৌবনে অজামিল ধার্মিক ব্রাহ্মণ রূপে ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। পরে, কোনও এক বারনারীর কুসংসর্গে মাধ্যমে, তিনি বাস্তবিকই জগতের মধ্যে সব চেয়ে হীনতম মানুষ হয়ে ওঠেন। তাঁর শেষ জীবনে যমরাজ তাঁর যমদূতদের পাঠিয়ে পাপী অজামিলের আত্মাকে টেনে আনতে বলেছিলেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তখনই তাঁর দেবদূতদের পাঠিয়ে অজামিলকে রক্ষা করেছিলেন এবং যমরাজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ভক্তদের বিব্রত করা কোনও অধঃস্তন পুরুষের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় কাজ। তাই *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।*

এখানে বিতর্ক উত্থাপিত হতে পারে যে, *স্মৃতিশাস্ত্রে* বলা হয়েছে, *শ্রুতি-স্মৃতি মমৈব আজ্ঞে*—বৈদিক শাস্ত্রাদি সবই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ আদেশাবলী। সুতরাং, প্রশ্ন করা যেতে পারে, শ্রীভগবান কেমন করে তাঁর ভক্তদের ক্ষেত্রেও তাঁর আদেশাবলী প্রায়ই লঙ্ঘনের অপরাধ মার্জনা করতে পারেন? এই ধরনের সম্ভাব্য আপত্তির উত্তর দিতেই *প্রিয়স্য* শব্দটি এই শ্লোকটির মধ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীভগবানের অতীব প্রিয়জন। যদিও স্নেহের শিশু কোনও মারাত্মক অপরাধ ঘটনাক্রমে করেও ফেলে, তা হলে স্নেহময় পিতা শিশুকে ক্ষমাই করেন, তিনি মনে করেন যে, শিশুটির যথার্থ কোনও সদুদ্দেশ্য থাকতেও পারে। সেইভাবেই, ভগবদ্ভক্তেরা যদিও তাদের ভবিষ্যতে কোনও দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষার জন্য শ্রীভগবানের কৃপালাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে অনুরোধ করে না, তা সত্ত্বেও শ্রীভগবান তাঁর করুণাবশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই ভক্তকে সকল প্রকার আকস্মিক পতনের পরিণাম থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকেন।

শ্রীভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি এই অহৈতুকী কৃপা প্রদান করেন, তা হল *পরমৈশ্বর্যম্* অর্থাৎ তাঁর পরম ঐশ্বর্য। ক্রমশ এইভাবেই নিষ্ঠাবান ভক্ত মুক্তিলাভের পথে অগ্রসর হতে থাকেন, এমন কি আকস্মিক পতন থেকেও রক্ষা পান, কারণ তিনি নিত্য শ্রীভগবানের চরণকমল স্মরণ করতে থাকেন এবং শ্রীভগবানের সন্তুষ্টি

বিধানের উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে আত্মস্থ থাকেন বলে তাঁর হৃদয় শুদ্ধতা লাভ করে থাকে। যদিও আত্মনিবেদিত ভগবদ্ভক্তদেরও মাঝে মাঝে কলুষিত তুচ্ছ আচার-আচরণের মাধ্যমে পীড়িত হতে লক্ষ্য করা যায়, তা হলেও সুনিশ্চিতভাবে তাঁরা ভগবৎ-কৃপায় রক্ষা পান এবং বাস্তবিকই কখনও জীবনে পরাজিত তথা ব্যর্থ হন না।

শ্লোক ৪৩

শ্রীনারদ উবাচ

ধর্মান্ ভাগবতানিত্থং শ্রুত্বাথ মিথিলেশ্বরঃ ।
জায়ন্তেয়ান্ মুনীন্ প্রীতঃ সোপাধ্যায়ো হ্যপূজয়ৎ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **ধর্মান্ ভাগবতান্**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উদ্দেশে নিবেদিত ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের বিজ্ঞান; **ইত্থম্**—এই ভাবে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণের পরে; **অথ**—তখন; **মিথিলা-ঈশ্বরঃ**—মিথিলা রাজ্যের অধিপতি রাজা নিমি; **জায়ন্তেয়ান্**—জয়ন্তীর পুত্রদের প্রতি; **মুনীন্**—মুনিগণ; **প্রীতঃ**—প্রীত হয়ে; **স-উপাধ্যায়ঃ**—পুরোহিতদের সাথে; **হি**—অবশ্য; **অপূজয়ৎ**—তিনি পূজা নিবেদন করলেন।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—এইভাবে ভগবদ্ভক্তিসেবার বিজ্ঞান কথা শ্রবণ করে মিথিলার রাজা শ্রীনিমি বিপুলভাবে প্রীতিলাভ করেন, এবং যজ্ঞের পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে, তিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীজয়ন্তীর ঋষিতুল্য পুত্রদের প্রতি পূজা নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

জায়ন্তেয়ান্ শব্দটির দ্বারা নবযোগেন্দ্রবর্গকে বোঝানো হয়েছে, যাঁরা শ্রীঋষভদেবের পত্নী শ্রীজয়ন্তীর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন।

শ্লোক ৪৪

ততোঽন্তর্দধিরে সিদ্ধাঃ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ।
রাজা ধর্মানুপাতিষ্ঠন্নবাপ পরমাং গতিম্ ॥ ৪৪ ॥

ততঃ—তখন; **অন্তর্দধিরে**—তাঁরা অন্তর্হিত হলেন; **সিদ্ধাঃ**—কবি প্রমুখ সিদ্ধপুরুষগণ; **সর্ব-লোকস্য**—উপস্থিত সকলে; **পশ্যতঃ**—তাঁরা যেমন লক্ষ্য করছিলেন; **রাজা**—রাজা; **ধর্মান্**—পারমার্থিক জীবনধারার নীতি; **উপাতিষ্ঠন্**—সযত্নে অনুসরণের মাধ্যমে; **অবাপ**—তিনি লাভ করেন; **পরমাম্**—পরম শ্রেষ্ঠ; **গতিম্**—লক্ষ্য।

অনুবাদ

তখন উপস্থিত সকলের চোখের সামনে থেকে সিদ্ধপুরুষগণ অন্তর্হিত হলেন। তাঁদের কাছ থেকে নিমিরাজ পারমার্থিক জীবনধারার যে সকল নীতি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তা নিষ্ঠা সহকারে পালনের মাধ্যমে তিনি জীবনের পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্মান্ ভাগবতান্ শ্রুতান্ ।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো যাস্যসে পরম্ ॥ ৪৫ ॥

ত্বম্—আপনি (বসুদেব); অপি—ও; এতান্—এই সকল; মহাভাগ—হে পরম ভাগ্যবান পুরুষ; ধর্মান্—নীতিসমূহ; ভাগবতান্—ভগবদ্ভক্তি সেবা; শ্রুতান্—যা আপনি শ্রবণ করলেন; আস্থিতঃ—অবস্থিত; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধাবিশ্বাসের সঙ্গে; যুক্তঃ—যুক্ত; নিঃসঙ্গঃ—জড়জাগতিক সঙ্গ বিবর্জিত; যাস্যসে—আপনি গমন করবেন; পরম্—পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

হে পরম ভাগ্যবান শ্রীবসুদেব, আপনি ভগবদ্ভক্তি সেবামূলক নীতিকথা যা কিছু শুনলেন, তা বিশ্বস্তভাবে কেবল অনুসরণ করুন এবং তা হলেই, জড়জাগতিক সঙ্গ মুক্ত হয়ে আপনি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে গমন করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পিতা শ্রীবসুদেবের কাছে শ্রীনারদমুনি তখন নিমিরাজের জ্ঞানলাভের কাহিনী বর্ণনা করলেন। এখন শ্রীনারদ মুনি অভিব্যক্ত করলেন যে, নবযোগেন্দ্রবর্গ বহুকাল পূর্বে যে সকল নীতি ব্যক্ত করেছিলেন, সেইগুলি শ্রীবসুদেব স্বয়ং অনুশীলনের মাধ্যমে জীবনের পরম সার্থকতা নিজেও অর্জন করবেন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীবসুদেব ইতিপূর্বেই পরমেশ্বর ভগবানের একান্ত পার্ষদ হয়েছিলেন, কিন্তু মহান ভক্ত রূপে তাঁর স্বাভাবিক বিনয়-নম্রতার ফলেই, তাঁর কৃষ্ণপ্রেম তিনি শুদ্ধ করে তুলতে মনস্থ করেছিলেন। এইভাবে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পিতারও সুমহান ভক্তসুলভ মর্যাদার দৃষ্টান্ত আমরা অনুধাবন করতে পারি।

সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু পরম পিতার মতোই জীবগণের প্রয়োজনে সব কিছু সরবরাহ করে থাকেন, তাই তাঁকে সর্বদাই পূজা করতে হয়। এই ধরনের মনোভাবের ফলে ভগবৎ-প্রেমের সার্থকতা লাভ হয় না, কারণ সন্তান যখন অল্পবয়সী থাকে, তখন তার পিতা ও মাতার জন্য তেমনভাবে

সেবা করতে পারে না। যখন শিশু খুবই ছোট থাকে, তখন বরং পিতামাতাই নিত্যনিয়ত সন্তানের সেবাযত্ন করে থাকেন। তাই যখন ভক্তরূপে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের মাতা কিংবা পিতার ভূমিকা পালন করতে থাকেন, তখন শ্রীভগবানকে পরম উল্লাসভরে নিজের সন্তান রূপে স্বীকার করার ফলে, শ্রীভগবানের সেবায় অপরিসীম প্রেমময়ী সেবা নিবেদনের অবকাশ লাভ করতে তিনি পারেন। শ্রীবসুদেবের পরম সৌভাগ্য যে, বহুকাল পূর্বে ঋষিতুল্য নিমিরাজকে নবযোগেন্দ্রবর্গ যে বিস্ময়কর উপদেশাবলী প্রদান করেছিলেন, তা শ্রীনারদমুনি স্বয়ং তাঁর সমক্ষে উপস্থাপিত করেন।

শ্লোক ৪৬

যুবয়োঃ খলু দম্পত্যোর্যশসা পূরিতং জগৎ ।
পুত্রতামগমদ্ যদ্ বাং ভগবানীশ্বরো হরিঃ ॥ ৪৬ ॥

যুবয়োঃ—আপনাদের দুজনের; **খলু**—অবশ্য; **দম্পত্যোঃ**—পতি-পত্নীর; **যশসা**—যশের দ্বারা; **পূরিতম্**—পরিপূর্ণ হয়ে; **জগৎ**—পৃথিবী; **পুত্রতাম্**—পুত্র হওয়ার ফলে; **অগমৎ**—গ্রহণ করে; **যৎ**—যেহেতু; **বাম্**—আপনার; **ভগবান্**—পরমেশ্বর শ্রীভগবান; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর শ্রীভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি।

অনুবাদ

অবশ্যই, সমগ্র জগৎ আপনার এবং আপনার পত্নীর মহিমায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি আপনার পুত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে *যশসা পূরিতং জগৎ* "সমগ্র জগৎ এখন আপনার মহিমায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে", এই শব্দগুলির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামের পিতামাতা শ্রীবসুদেব এবং শ্রীমতী দেবকীর গৌরবের কথা শ্রীনারদ মুনি উল্লেখ করেছেন। পরোক্ষভাবে বলা যায়, শ্রীবসুদেব যদিও শ্রীনারদ মুনির কাছে পারমার্থিক উন্নতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন, তবু শ্রীনারদ মুনি এখানে বক্তব্য রেখেছেন, "পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রতি আপনার অসামান্য ভক্তিভাবের ফলে আপনি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠেছেন।"

শ্লোক ৪৭

দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ শয়নাসনভোজনৈঃ ।
আত্মা বাং পাবিতঃ কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্বতোঃ ॥ ৪৭ ॥

দর্শন—দর্শনের ফলে; **আলিঙ্গন**—আলিঙ্গনের ফলে; **আলাপৈঃ**—এবং বাক্যালাপের মাধ্যমে; **শয়ন**—বিশ্রাম গ্রহণের মাধ্যমে; **আসন**—উপবেশন করার মাধ্যমে; **ভোজনৈঃ**—এবং আহারের মাধ্যমে; **আত্মা**—হৃদয়গুলি; **বাম্**—আপনাদের দুজনের; **পাবিতঃ**—পবিত্র হয়ে গেছে; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **পুত্রস্নেহম্**—পুত্রের প্রতি স্নেহ; **প্রকুর্বতোঃ**—যিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে প্রিয় বসুদেব, আপনাদের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করার ফলে, আপনি এবং আপনার পত্নী দেবকী অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিপুলভাবে দিব্য প্রেমভাব অভিব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই, আপনারা সকল সময়ে শ্রীভগবানকে দেখেছেন, তাঁকে আলিঙ্গন করছেন, তাঁর সাথে কথা বলছেন, তাঁর সাথে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন, তাঁর সাথে উপবেশন করছেন এবং তাঁর সাথে আহার ভোজন করছেন। এই শ্রীভগবানের সাথে স্নেহঘন নিবিড় সঙ্গলাভের ফলে নিঃসন্দেহে আপনারা উভয়ে আপনাদের হৃদয়গুলি সম্পূর্ণভাবেই শুদ্ধ করে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে বলা চলে, আপনারা ইতিমধ্যে সার্থক হয়ে উঠেছেন।

তাৎপর্য

আত্মা বাং পাবিতঃ শব্দগুলি এই শ্লোকের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তিযোগের বিধিবদ্ধ নীতিগুলি অভ্যাস-অনুশীলনের মাধ্যমে এবং ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে তাদের ক্রিয়াকলাপ নিবেদনের পদ্ধতিগুলি শিক্ষালাভের মাধ্যমেই সাধারণ বদ্ধজীবগণকে তাদের জীবনধারা পরিশুদ্ধ করে নিতে হয়। সেই ধরনের বিধিবদ্ধ ক্রমান্বয়ী পদ্ধতি অবশ্যই উন্নত মহাত্মাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ তাঁরা স্বয়ং শ্রীভগবানকে সেবা উৎসর্গ করে থাকেন তাঁর পিতামাতা, সখা, সখী উপদেষ্টা, পুত্রাদি রূপের মাধ্যমে। পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বসুদেব ও দেবকীর গভীর ভালবাসায়, তাঁরা ইতিমধ্যেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরম সার্থকতার পর্যায়ে উপনীত হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও পূর্ববর্তী শ্লোকে নারদমুনি বসুদেবকে জানিয়েছেন যে, বসুদেব এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবার ফলে, তাঁরা মহিমান্বিত হয়েছেন, তবু শ্রীবসুদেব মন্তব্য করতে পারতেন যে, শ্রীভগবানের অন্যান্য পার্ষদেরা, যেমন জয় এবং বিজয়, ব্রাহ্মণদের অবমাননা করার ফলে পতিত হয়েছিলেন। তাই, বর্তমান শ্লোকটিতে শ্রীনারদমুনি *পাবিতঃ* শব্দটি ব্যবহার করেছেন—"আপনারা সম্পূর্ণ পবিত্র, এবং তাই আপনাদের গভীর কৃষ্ণপ্রেমের ফলে আপনারা আপনাদের ভগবদ্ভক্তি সেবার পথে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতির সম্ভাবনা থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষ্য থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গীরূপে তাঁর পিতা শ্রীবসুদেব প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর শ্রীভগবানেরই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ছিলেন, এবং তাঁর রমণীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেবার অতীব ভাবোল্লাসময় বাসনায় তিনি সদাসর্বদা নিমজ্জমান হয়েছিলেন। অবশ্য, শ্রীনারদমুনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, অসামান্য বিনয়বশত বসুদেব নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করতেন এবং তাই শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের দিব্য উপদেশাবলী গ্রহণের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করতেন। শ্রীবসুদেবের ভাবোল্লাসময় বিনয় স্বীকার করে নিয়ে, তাঁকে তাঁর উদ্বেগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বাসনায়, শ্রীনারদমুনি যেভাবে কোনও সাধারণ মানুষকে ভক্তিযোগের বিজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ দিতেন, সেইভাবেই তাঁকে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। অবশ্য, একই সময়ে শ্রীনারদমুনি অভিব্যক্ত করেছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে বসুদেব ও দেবকী ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে তাঁদের পুত্র রূপে লাভের অভাবনীয় অভূতপূর্ব সৌভাগ্যের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠেছেন। অতএব, শ্রীবসুদেবকে শ্রীনারদমুনি বলেছেন, "হে বসুদেব, আপনার মর্যাদা সম্পর্কে কোনওভাবে হতাশ কিংবা সন্দিহান হবেন না। নিঃসন্দেহে আপনি অনতিবিলম্বে নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন। আর বাস্তবিকই আপনি এবং আপনার উত্তমা স্ত্রী মহাভাগ্যবান।"

উপসংহারে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুপ্ত প্রেম ভালোবাসা পূর্ণভাবে বিকশিত করার মাধ্যমে প্রত্যেকেই ভাগ্যবান হতে পারে। অনেক ভীষণ দানবও শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করলেও, অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমেই সুখময় জীবনধারা লাভ করেছিল। অতএব প্রেমময় যেসব ভগবদ্ভক্ত দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে চিন্তাভাবনা করে থাকেন, তাঁরাও নিঃসন্দেহে প্রেমময় ভগবদ্ভক্তদের প্রাপ্য পরমানন্দ লাভ করেই থাকেন।

শ্লোক ৪৮

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌণ্ড্র-
শাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ ৪৮ ॥

বৈরেণ—শত্রুতা সহ; **যম্**—যাঁকে (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে); **নৃ-পতয়ঃ**—নৃপতিরা; **শিশুপাল-পৌণ্ড্র-শাল্ব-আদয়ঃ**—শিশুপাল, পৌণ্ড্রক, শাল্ব প্রমুখ; **গতি**—তাঁর

গতিবিধির উপরে; **বিলাস**—ক্রীড়াসূচক; **বিলোকন**—দৃষ্টিপাতে; **আদ্যৈঃ**—এবং নানাভাবে; **ধ্যায়ন্ত**—চিন্তা করে; **আকৃত**—মনস্থির করে; **ধিয়ঃ**—তাদের মন; **শয়ন**—শয়নকালে; **আসন-আদৌ**—উপবেশন, ইত্যাদিতে; **তৎ-সাম্যম্**—তাঁর সাথে সমান পর্যায়ে (অর্থাৎ নিত্য, দিব্য জগতে); **আপুঃ**—তারা লাভ করে; **অনুরক্ত-ধিয়াম্**—যাদের মন স্বভাবই অনুরাগী; **পুনঃ কিম্**—তুলনা করে আর কী বলা যায়।

অনুবাদ

শিশুপাল, পৌণ্ড্রক এবং শাল্ব প্রমুখ শত্রুভাবাপন্ন রাজারা সকল সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রতিকূল চিন্তাভাবনা করত। এমনকি যখন তারা শয়নে, উপবেশনে কিংবা অন্য কোনও কাজকর্মে নিয়োজিত থাকত, তখনও শ্রীভগবানের শারীরিক গতিবিধি, তাঁর ক্রীড়া বিনোদন, তাঁর ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রেমময় দৃষ্টিপাত, এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় ভাববিলাসের প্রতি মন ঈর্ষাভরে আকৃষ্ট এবং মগ্ন হত। এইভাবে সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় তাদের মন মগ্ন থাকার ফলে, তারা ভগবদ্ধামে দিব্য মুক্তি অর্জন করেছিল। তা হলে যারা অনুকূলভাবে প্রেমময় মানসিকতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় তাদের মন সকল সময়ে মগ্ন রাখে, সেই সকল অনুরাগী ভক্তজনের কথা আর কী বলার আছে?

তাৎপর্য

এই জগৎ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের সময়ে, বসুদেব চিন্তা করতে থাকেন যে, তিনি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ উপস্থিতির সুযোগ যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠার প্রয়াস করেনি, তাই মর্মবেদনায় তিনি পরিপূর্ণভাবে মর্মাহত হয়ে উঠেছিলেন। যাই হোক, শ্রীনারদ মুনি অবশ্য বসুদেবকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন যে, বসুদেব এবং তাঁর সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী দেবকীর গৌরবগাথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী উচ্চারিত হচ্ছে, কারণ দেবতাগণও শ্রীভগবানের আপন পিতামাতার মহিমান্বিত মর্যাদার আরাধনা করে থাকেন। বসুদেব কেবলমাত্র তাঁর নিজের পারমার্থিক মর্যাদার বিষয় সম্পর্কেই চিন্তাকুল হননি, বরং তিনি যদুবংশের জন্যও দুঃখবোধ করছিলেন, কারণ শ্রীনারদমুনির মতো বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আক্রান্ত হয়ে এবং এক বিপুল ভ্রাতৃহন্তা যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে তারা আপাতদৃষ্ট এক অশুভ পরিবেশে পৃথিবী-ত্যাগ করেছিল। যদিও যদুবংশের সকলেই শ্রীভগবানের আপনজন ছিলেন, তাই পৃথিবী থেকে তাদের তিরোভাব আপাতদৃষ্টিতে অশুভ বলেই মনে হয়। তাই বসুদেব তাদের শেষ গতি সম্পর্কে চিন্তাকুল হয়েছিলেন। তাই শ্রীনারদমুনি শ্রীবসুদেবকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, শিশুপাল, পৌণ্ড্রক এবং শাল্বের মতো কৃষ্ণবিরোধী দানবেরাও তাদের অবিরাম কৃষ্ণবিষয়ক চিন্তমগ্নতার ফলে ভগবদ্ধামেই উত্তীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

অতএব যদুবংশের মহান বংশধরেরা যারা বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণকে সবার থেকেও ভালবাসতেন (*অনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্*), তাদের কথা আর বলার কি আছে? তেমনই, *গরুড়পুরাণে* বলা হয়েছে—

অজ্ঞানিনঃ সুরবর্যং সমধিক্ষিপন্তো
যং পাপিনোঽপি শিশুপালসুযোধনাদ্যাঃ ।
মুক্তিং গতাঃ স্মরণমাত্রবিধূতপাপাঃ
কঃ সংশয়ঃ পরমভক্তিমতাং জনানাম্ ॥

"এমন কি শিশুপাল এবং দুর্যোধনের মতো মূর্খ পাপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে কটুবাক্য বর্ষণে বিব্রত করা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার মাধ্যমেই সকল পাপরাশি থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। যে কোনও ভাবেই হোক, তাদের মন শ্রীভগবানের চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এবং তার ফলে তারা মুক্তি লাভ করে। তা হলে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক ভাবধারায় যারা গভীরভাবে আত্মমগ্ন হয়ে থাকে, তাঁদের পরমগতি সম্পর্কে সন্দেহের কী অবকাশ থাকে?"

শ্রীবসুদেবও উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন, কারণ এক দিকে তিনি জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি শ্রীভগবানকে তাঁর স্নেহভাজন পুত্রের মতো লালনপালন করেছেন। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে, অনেক সময়ে পুত্রকে তিরস্কার করা এবং নানাভাবে তাকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া পিতার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হয়েই থাকে। এইভাবে শ্রীবসুদেব চিন্তা করছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্রের মতো শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে তিনি ভগবানের অবমাননা করেছেন। অবশ্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বস্তুত প্রীতিলাভ করেই থাকেন, যখন কোনও শুদ্ধভক্ত তাঁর প্রতি অপত্যস্নেহে মগ্ন হয়ে থাকেন, এবং তার ফলে ভক্তিভাবে শ্রীভগবানের যত্নবিধানে সযত্ন হন, যেমনভাবে স্নেহপ্রবণ পিতামাতা ছোট শিশুসন্তানকে যত্ন করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তরুণ বালকরূপে সেই ধরনের ভক্তবৃন্দের কাছে আবির্ভূত হয়ে এবং তাঁদের পুত্রসন্তানের মতোই আবরণলীলা বিলাসের মাধ্যমে ঐ ধরনের ভক্তদের গভীর ভক্তিভাবের আনুকূল্যে যথাযথ আচরণ অভিব্যক্ত করেন।

এই শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দানবেরা বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুভাবে তিরস্কার করেছিল। তা সত্ত্বেও, ঐ ধরনের দানবেরা শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় মগ্নতার ফলেই মুক্তি লাভ করেছিল। অতএব, শ্রীবসুদেবের সদ্‌গতি সম্পর্কে আর বেশি কী বলার আছে, যেহেতু তিনি তাঁর অফুরন্ত পিতৃস্নেহের বশেই শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করতেন? উপসংহারে তাই বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষে শ্রীবসুদেব এবং শ্রীমতী

দেবকীকে কখনই সাধারণ বদ্ধ জীব বলে মনে করা উচিৎ নয়। পরমেশ্বর শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে *বাৎসল্যরস* তথা পিতামাতার স্নেহ ভালবাসার আকারেই দিব্যস্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁদের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিরাজিত ছিল। জড় জগতের পিতামাতার স্নেহের সঙ্গে এই সম্পর্কের কোনও তুলনা চলে না, কারণ তাঁরা জড়জাগতিক উপভোগের মাধ্যমরূপেই সন্তানদের যত্ন নিয়ে থাকেন যাতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষ চরিতার্থ হতে পারে।

শ্লোক ৪৯

মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্বাত্মনীশ্বরে ।
মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্যে পরেঽব্যয়ে ॥ ৪৯ ॥

মা—করে না; **অপত্য-বুদ্ধিম্**—আপনার পুত্ররূপে চিন্তা করে; **অকৃথাঃ**—আরোপ করে; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের উপরে; **সর্ব-আত্মনি**—সকলের পরমাত্মা; **ঈশ্বরে**—পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **মায়া**—তাঁর মায়াশক্তির প্রভাবে; **মনুষ্য-ভাবেন**—সাধারণ মানুষের রূপে আবির্ভূত হয়ে; **গূঢ়-ঐশ্বর্যে**—তাঁর ঐশ্বর্য গোপন রেখে; **পরে**—পরম; **অব্যয়ে**—অচ্যুত, অক্ষয়।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ শিশু মনে করবেন না, কারণ তিনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, অব্যয় অচ্যুত, সর্বজনেরই পরমাত্মাস্বরূপ। শ্রীভগবান অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য গোপন রেখে, সাধারণ মানুষের মতোই আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্বের সকল অংশপ্রকাশের মূল উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*। তাঁর অনন্ত দিব্য ঐশ্বর্যের শেষ হয় না, তাই তিনি অতি সহজেই সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবেরই নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই শ্রীবসুদেবের নিজের ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে, কিংবা যদুবংশের সদস্যদের মতো শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদবর্গের ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে কোনও দুশ্চিন্তা করবার কারণ ছিল না। এই অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকটিতে, শ্রীনারদ মুনি শ্রীবসুদেবকে বলেছেন, *পুত্রতাম্ অগমদ্ যদ্ বাং ভগবান্ ঈশ্বরো হরিঃ*—"আপনি এবং আপনার সাধ্বী স্ত্রী এখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহিমান্বিত হয়েছেন, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আপনার পুত্র হয়ে এসেছেন।" এইভাবে, শ্রীনারদমুনি শ্রীকৃষ্ণকে অতি প্রিয়পুত্র রূপে ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শ্রীবসুদেবকে উৎসাহিত করছেন, কারণ ঐ ধরনের দিব্য আনন্দময় ভক্তিভাব কখনও বর্জন করা উচিৎ নয়। কিন্তু

একই সঙ্গে, শ্রীনারদমুনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রীবসুদেবের সন্দেহ দ্বিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, "আপনার কৃষ্ণপ্রেমের জন্যই আপনি তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করতে পারেন। আপনি মানুষরূপে জন্মেছেন, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবলই আপনার সঙ্গে সমভাবাপন্ন হয়ে চলেছেন। আপনার পুত্ররূপে তাঁকে ভালবাসার জন্য আপনাকে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে, তিনি নিজেকে আপনার শাসনাধীন করে রেখেছেন। আর এইভাবেই, তাঁর অচিন্তনীয় শক্তি এবং ঐশ্বর্য আপনার কাছ থেকে তিনি গোপন করে রেখেছেন। অবশ্যই আপনি ধারণা করবেন না যে, এই জগতের ঘটনাবলীর মাধ্যমে কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতি বাস্তবিকই সৃষ্টি হয়েছে। যদিও শ্রীকৃষ্ণ আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, বাস্তবে তিনি নিত্য কালই পরম নিয়ন্তা রূপে বিরাজিত। সুতরাং তাঁকে মানবশিশু মনে করবেন না। সর্বদাই তিনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান।"

এই শ্লোকটিতে *মায়া* শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণের *মনুষ্য*, অর্থাৎ মানবরূপী ক্রিয়াকলাপ বাস্তবিকই সাধারণ মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর, কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান। *মায়া* শব্দটিও বোঝায় "অপ্রাকৃত দিব্য শক্তিরাজি"। *ভগবদ্গীতায়* তাই বলা হয়েছে, *সম্ভবাম্যাত্মা মায়য়া*—শ্রীভগবান তাঁর দিব্য শক্তিরাজি সমন্বিত হয়েই নিজ দিব্য রূপে অবতরণ করে থাকেন। আর তাই *মায়ামনুষ্যভাবেন* কথাটিও এখানে বোঝায় শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ দিব্য রূপ, যা এই জগতে দৃষ্ট মানবরূপেই অনুরূপ হয়ে থাকে। *মায়া* শব্দটিও সংস্কৃত অভিধান অনুযায়ী বোঝায় "কৃপা" অর্থাৎ "করুণা", এবং তাই বদ্ধ জীবগণের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা রূপেই ভগবানের অবতারত্বের উপলব্ধি করতে হয়। শ্রীভগবানের অবতরণ ও মুক্তাত্মা জীবগণের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা, কারণ শ্রীভগবানের অবতার-লীলায় যোগদান করে এবং ঐ ধরনের মহিমান্বিত দিব্য ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে তাঁরা বিপুল আনন্দ লাভ করে থাকেন। (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো*)।

শ্রীবসুদেবের ভগবৎ-প্রেমের সাথে পারস্পরিক আদানপ্রদানের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর অনন্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। এই ভাবেই, শ্রীভগবানের সাথে বিশেষভাবে প্রেমময়ী সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে তাঁকে সর্বপ্রকারে সুযোগ দেওয়া হয়। অবশ্য, ব্রাহ্মণদের অভিশাপের দ্বারা উদ্ভূত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি উদ্ভব হলে, শ্রীবসুদেব উদ্বেগাকুল হয়ে উঠেন এবং শ্রীনারদ তৎক্ষণাৎ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঐ ধরনের উদ্বেগ অনাবশ্যক, কারণ এই সব ঘটনাই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। এইভাবেই, যে সকল বৈষ্ণব

পরমহংসগণ শ্রীভগবানের পিতামাতা রূপে অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা সর্বদাই শ্রীভগবানের আশ্রয়াধীন থাকেন এবং কখনও শ্রীভগবানের প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের ব্রত থেকে বিচ্যুত হন না। তাঁরা সর্বদাই দিব্যভাবে মগ্ন হয়ে থাকেন, সকল পরিবেশের মধ্যেই এবং জড়জাগতিক সাধারণ পিতামাতাদের মতো তাঁরা দেহাত্মবুদ্ধির মায়াধীন হয়ে নিত্য বিভ্রান্ত হন না।

শ্লোক ৫০

ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে গুপ্তয়ে সতাম্ ।
অবতীর্ণস্য নির্বৃত্যৈ যশো লোকে বিতন্যতে ॥ ৫০ ॥

ভূ-ভার—যারা পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করে রয়েছে; **অসুর**—অসুরগণ; **রাজন্য**—রাজকীয় বংশজাত মানুষেরা; **হন্তবে**—হত্যা করার উদ্দেশ্যে; **গুপ্তয়ে**—গোপনে রাখার উদ্দেশ্যে; **সতাম্**—ঋষিতুল্য ভক্তবৃন্দের; **অবতীর্ণস্য**—তাঁর অবতরণের জন্য; **নির্বৃত্যৈ**—মুক্তি প্রদানের জন্যও; **যশঃ**—যশ; **লোকে**—সমগ্র পৃথিবীতে; **বিতন্যতে**—প্রসার লাভ করেছে।

অনুবাদ

পৃথিবীর ভার বৃদ্ধিকারী আসুরিক রাজাদের বধ করে ঋষিতুল্য ভক্তদের জন্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন। অবশ্য, অসুর এবং ভক্তবৃন্দ উভয়কেই শ্রীভগবৎ-কৃপায় মুক্তি প্রদান করা হয়। এইভাবেই, তাঁর দিব্য যশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রসারলাভ করে থাকে।

তাৎপর্য

এই জড়জাগতিক পৃথিবীতে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান কিভাবে অবতরণ করেন, সেই বিষয়ে সন্দেহ জাগতে পারে। আর যেহেতু তিনি লক্ষকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, তাই পূতনা নামে রাক্ষসীর বক্ষ শোষণের মাধ্যমে তার প্রাণবায়ু হরণের দ্বারা তাকে বধ করার মতো শ্রীভগবানের কীর্তিকলাপকে ভক্তগণ বিস্ময়কর বলে গুণকীর্তন করে থাকেন কেন? যদিও এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ অবশ্যই সাধারণ মানুষদের আয়ত্ত্বের অতীত, তবে তা যখন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীভগবানের দ্বারাই সংঘটিত হয়, তখন তারা সেই কাজটিকে বিস্ময়কর মনে করে কেন? এই শ্লোকের মধ্যে *নির্বৃত্যৈ* শব্দটির মাধ্যমে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। শ্রীভগবান অসুরদের বধ করেন তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়ার জন্য নয়, বরং তাদের দিব্য মুক্তি প্রদানের জন্য। তাই পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্তনীয় লীলার মাধ্যমে ভক্তবৃন্দ এবং দৈত্যকুল উভয়েরই মুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের অকল্পনীয়

লীলাবিলাস থেকে স্পষ্টতই শ্রীভগবান এবং অন্যান্য জীবগণ, মানুষ অথবা দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বলা হয় যে, *মুক্তিপ্রদাতা সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ*—একমাত্র শ্রীবিষ্ণুই জন্ম ও মৃত্যুর অতীত মুক্তিপ্রদান করতে সক্ষম। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নির্দেশ করেছেন যে, অসুরদের সাধারণত ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে নির্বিশেষ মুক্তি প্রদান করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ভগবৎ-প্রেমের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ স্বরূপ ভগবদ্ভক্তদের চিন্ময়লোকে স্থান দেওয়া হয়। এইভাবে, শ্রীভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপা সকল শ্রেণীর জীবকে প্রদান করে থাকেন, এবং তাঁর যশ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ দিব্য সত্তা, তাই তাঁর যশগৌরব তাঁর নিজ অবতার থেকে ভিন্ন হয় না, তাই শ্রীভগবানের যশোগাথা যতই প্রসারলাভ করে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ততই মুক্তিলাভ করতে থাকে। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের এই কয়েকটি মাত্র অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হল।

শ্লোক ৫১

শ্রীশুক উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগো বসুদেবোঽতিবিস্মিতঃ ।
দেবকী চ মহাভাগা জহতুর্মোহমাত্মনঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এতৎ**—এই; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **মহাভাগঃ**—মহাভাগ্যবান; **বসুদেবঃ**—রাজা শ্রীবসুদেব; **অতি-বিস্মিতঃ**—অতিশয় বিস্মিত হয়ে; **দেবকী**—শ্রীমতী দেবকী মাতা; **চ**—এবং; **মহাভাগা**—মহা ভাগ্যবতী; **জহতুঃ**—তাঁরা উভয়ে পরিত্যাগ করলেন; **মোহম্**—বিভ্রান্তি; **আত্মনঃ**—তাঁদের নিজেদের।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—এই বর্ণনা শুনে, মহাভাগ্যবান শ্রীবসুদেব বিস্ময়ে সম্পূর্ণ হতবাক হলেন। এইভাবে তিনি এবং তাঁর মহাভাগ্যবতী স্ত্রী শ্রীমতী দেবকী সমস্ত উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি বর্জন করে তাঁদের হৃদয় শান্ত করলেন।

শ্লোক ৫২

ইতিহাসমিমং পুণ্যং ধারয়েদ্ যঃ সমাহিতঃ ।
স বিধূয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫২ ॥

ইতিহাসম্—ঐতিহাসিক বর্ণনা; **ইমম্**—এই; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **ধারয়েৎ**—ধ্যানমগ্ন হয়ে; **যঃ**—যিনি; **সমাহিতঃ**—একাগ্র মনে; **সঃ**—তিনি; **বিধূয়**—পরিষ্কার করে; **ইহ**—ইহজীবনেই; **শমলম্**—কলুষতা; **ব্রহ্মভূয়ায়**—পরম পারমার্থিক সিদ্ধি; **কল্পতে**—লাভ করে।

অনুবাদ

এই পুণ্য পবিত্র ঐতিহাসিক উপাখ্যানে যিনি একাগ্র মনে ধ্যানমগ্ন হন, তিনি ইহজীবনের সমস্ত কলুষতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন এবং পরম পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে থাকেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'বসুদেবের প্রতি শ্রীনারদ মুনির উপদেশের শেষাংশ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।